HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ০৩ **সুমেরীয় সভ্যতা**

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৬ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৭ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ০৩ - সুমেরীয় সভ্যতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সুমেরীয় সভ্যতা

আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সভ্যতা গড়ে ওঠে, যার সম্মিলিত নাম মেসোপটেমীয় সভ্যতা। গ্রিক ঐতিহাসিকেরা সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের নাম দেন মেসোপটেমিয়া। এর অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। (Mesos > between Potamos > river)। আর মেসোপটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিল সুমেরীয় সভ্যতা।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা ও ফোরাত) নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড আরব মরুভূমির উত্তরাঞ্চলকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, এর আকৃতি দেখতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মতো। এ কারণে ভূগোলবিদ ব্রেসটেড (Breasted) এ অঞ্চলের নাম দিয়েছেন উর্বর অর্ধচন্দ্রিকা (Fertilecresent)। পশ্চিমে মিশর থেকে শুরু করে পূর্ব পারস্য উপসাগরের তীর পর্যন্ত এ উর্বর এলাকা বিস্তৃত। এলাকাটি কৃষি উপযোগী হওয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি যেমন– সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, ক্যালডীয় সভ্যতা গড়ে তোলে।

সুমেরীয় সভ্যতা

সুমেরীয় সভ্যতা

সুমেরীয়দের পরিচয় : সুমেরীয়দের আদি নিবাস মেসোপটেমীয় অঞ্চলে ছিল না। তারা খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের দিকের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত এলেমের পার্বত্য অঞ্চল হতে উন্নত জীবনযাপন ও কৃষি ব্যবস্থার সুবিধার জন্য মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণের নিম্নাঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। সুমেরীয়দের নামানুসারে অঞ্চলটি পরিচিতি লাভ করে সুমের নামে। তাদের গড়ে তোলা সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, সুমেরীয়রা মধ্য এশিয়ার মালভূমি থেকে সমুদ্রপথে আগমন করেছে। কেউ কেউ বলেন, পারস্যের সুসা অঞ্চল থেকে তারা আগমন করেছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতে, তারা যাযাবর। বিভিন্ন পশুর জীবাশ্ম দেখে তারা বলেন, তাদের পশুপ্রীতি ছিল। একদল নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, সুমেরীয়দের চুল ছিল কালো। আর এ থেকে ধারণা করা হয়, কালো মাথা থেকে সুমের নামের উৎপত্তি।

সুমেরীয়দের রাজনৈতিক কাঠামো : সুমেরীয়দের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না। উর, ত্রিপুর, লাগাস, এরিদু, কিশ, নিপ্পর ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য নগররাষ্ট্র। প্রত্যেকটি নগরের আলাদা প্রশাসন, দেবতা ছিল। শুধু সামরিক প্রয়োজনে সুমেরীয়রা কেন্দ্রীয় সংগঠন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। নগররাষ্ট্রের প্রধানকে বলা হতো পাতেসি (Patesi)। তিনি ছিলেন একাধারে নগরপতি, সেনাপ্রধান এবং সেচ ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক। বিশেষ সময়ে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত।

সুমেরীয় সভ্যতা

সুমেরীয়দের অর্থনৈতিক কাঠামো : সুমেরীয়দের অর্থব্যবস্থা জটিল ছিল না। তাদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি। জমাজমিতে সাধারণ কৃষকদের স্বত্ব বলবৎ ছিল। তাদের সেচ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হতো। তারা কাঠের লাঙল ব্যবহার, ধাতু নির্মিত কাস্তে, নিড়ানি ইত্যাদির দ্বারা উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলে। শাসক, যাজক, ভূস্বামী, সামরিক কর্মকর্তা, স্বাধীন কৃষক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমিদাসের নিয়ন্ত্রণে কৃষি জমি ছিল। বছরে তিনটি ফসল উৎপাদিত হতো। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ছিল– গম, যব, বার্লি, খেজুর ও শাকসবজি। চাকাওয়ালা গাড়ি ও ঘোড়া গাড়ির মাধ্যমে ফসলাদি এক স্থান হতে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করা হতো। তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক উৎস ছিল বাণিজ্য। ধাতু, কাঠ, কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ পার্শ্ববর্তী উত্তর ও পশ্চিমের নিচু উপত্যকার অঞ্চলসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি চলত। প্যালেস্টাইন, ফিনিশিয়া, ক্রিট, ইজিয়ান দ্বীপসমূহ, এশিয়া মাইনর ইত্যাদি অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। উত্তর ভারতে প্রাপ্ত 'সিল' দেখে মনে করা হয়, সম্ভবত ভারতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে তারা সোনা, রুপা ইত্যাদি ব্যবহার করত। তখন সুদের ব্যবসায় চালু ছিল। সুমেরীয়রা তামা ও টিন আমদানি করত।

সুমেরীয় সভ্যতা

সুমেরীয়দের সমাজ কাঠামো : সুমেরীয় সমাজে সাধারণত তিন শ্রেণির লোক পরিলক্ষিত হয়। যেমন— ১. অভিজাত সম্প্রদায় রাজা, রাজপরিবার, পুরোহিত, সামন্তপ্রভু, রাজকীয় উপদেষ্টা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ২. চিকিৎসক, শিক্ষক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বাধীন কৃষক, কারিগর ও শ্রমিক ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের নাগরিক। ৩. সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরা। দাসরা যুদ্ধে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে পারত না। রাজা ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তবে নগরে অবস্থিত মন্দিরগুলোর কর্তৃত্ব ছিল পুরোহিতদের। উচ্চশ্রেণি কর্তৃক নিম্নশ্রেণি শোষিত হতো। যুদ্ধে পরাজিত যোদ্ধা এবং নিঃস্ব ব্যক্তিরা দাস শ্রেণিতে পরিণত হতো। এছাড়া হাটে দাস কেনাবেচা হতো । সুমেরীয়দের সমাজ ছিল বৈষম্যমূলক এবং শ্রেণিবিভাগে বিভক্ত। তাদের পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। তবে নারীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখতে পারত। বর তার সম্ভাব্য স্ত্রীকে যৌতুক দিত। সুমেরীয়দের সমাজে প্রথমে নারীদের মর্যাদা অনেক উঁচুতে থাকলেও পরবর্তীতে নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে থাকে ।

সুমেরীয় সভ্যতা

সুমেরীয়দের ধর্ম : সুমেরীয়রা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজা করত। সূর্য দেবতা শামাস; বন্যা, বৃষ্টি ও বাতাসের দেবতা এনলিল; পানির দেবতা এনকি; প্রেম ও উর্বরতার দেবী ইশতার; প্লেগ রোগের দেবতা নারগল ইত্যাদি দেবতা ছিল প্রধান। এছাড়া প্রত্যেকটি নগরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল। যেমন– উরুক নগরীর দেবী ছিলেন ইনিনি। কারের নগরের রক্ষাকারী দেবতা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হতো এনলিল দেবতাকে। এনকি দেবতাকে কৃষককুল অত্যন্ত মর্যাদাদান করত। প্রত্যেক নগরে একটি কেন্দ্রীয় মন্দির ছিল। উর নগরীতে নির্মিত 'জিগুরাত' (Ziggurat) মন্দির ৭টি স্থাপত্য দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটি উপাসনালয় ছাড়াও একাধারে শস্যগোলা, সেনাছাউনি, কোষাগার, সচিবালয় ইত্যাদি মর্যাদা ভোগ করত।

দেবদেবীর সন্তুষ্টির জন্য তারা গৃহপালিত পশু যেমন– গরু, ছাগল, ভেড়া, কবুতর, ফলমূল, মাখন, ঘি ইত্যাদি উৎসর্গ করত। তবে পরকালে তারা বিশ্বাসী ছিল না। অনেকে ধর্মীয় প্রধান রাজার সঙ্গে কবরস্থ হওয়ার জন্য চেতনানাশক মদপান করে একই কবরে কবরস্থ হতো।

সুমেরীয় সভ্যতা

সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতি : সুমেরীয়রা লিখন পদ্ধতিতে মৌলিকত্বের ছাপ রাখে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে তারা প্রথমে চিত্রভিত্তিক, পরে চিত্রলিপি এবং শেষে কিউনিফর্ম লিপি (Cuneiform) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। তবে তারা কোনো বর্ণমালা সৃষ্টি করতে পারেনি। এছাড়া ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষণ, উপসর্গ ইত্যাদি না থাকায় অর্থ বোধগম্য করতে ভীষণ অসুবিধা হতো। নলখাগড়া বা মানুষের মাথার খুলি, পাখি, মাছ, গাছ কিংবা বর্শা ব্যবহার করে তারা মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করত। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে সুমেরীয় অঞ্চলে কয়েকটি করণিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কাদামাটি আগুনে পুড়িয়ে কখনো একটি অক্ষর, কখনো একটি স্বরবর্ণ, কখনো একটি শব্দ এমন মোট ৫০০-এর বেশি কিলকাকার সাংকেতিক চিহ্ন ছিল।

সুমেরীয় সভ্যতা

সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

সুমেরীয়দের সাহিত্য : সুমেরীয়দের সাহিত্য রাজাদের সাথে দেবতার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, তাদের সাহিত্য ছিল পুরাকাহিনিনির্ভর। সুমেরীয় সাহিত্যের বিখ্যাত ছিল 'প্লাবনের মহাকাব্য'। এছাড়া ইউরুকের কিংবদন্তির রাজা গিলগামেশকে কেন্দ্র করে প্রাচীন সুমেরে রচিত হয় বিখ্যাত গিলগামেশ মহাকাব্য।

সুমেরীয় সভ্যতা

সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

সুমেরীয় আইন : সুমেরীয় সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য একটি আইন কাঠামো গড়ে তোলে। সম্রাট ডুঙ্গি (Dungi) এ আইন তৈরি করেন। তিনি স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আইনসমূহকে সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করেন। এ আইনের ধারাগুলো খুব কঠোর প্রকৃতির ছিল। এগুলো ছিল প্রতিশোধমূলক আইন। যেমন– হাতের বদলে হাত, চোখের বদলে চোখ ইত্যাদি। সম্রাট ডুঙ্গির আইন গ্রহণ করে পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় সম্রাট হাম্মুরাবি তার 'আইন সংহিতা' (The Code of Hummurabi) প্রণয়ন করেন।

সুমেরীয় সভ্যতা

সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

জ্ঞান-বিজ্ঞান : ধর্ম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন সুমেরে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল। ধর্মীয় উৎসবের সময় বের করতে গিয়েই তারা জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শুরু করে। তারা চাঁদের আবর্তনের ওপর নির্ভর করে জলঘড়ি ও চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন করে। তারা ১২ মাসে বছর, ৬০ মিনিটে ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টায় দিন এবং ৭ দিনে সপ্তাহ নির্ধারণ করে।

সুমেরীয় সভ্যতা

সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

সুমেরীয় স্থাপত্য ও শিল্প : ধারণা করা হয় সুমেরীয় নগর সভ্যতার পোড়া ইটের প্রথম ব্যবহার। তবে মিশরীয়দের মতো সুমেরীয়রা পাথরের ব্যবহার করত না বলে তাদের তৈরি ইমারত দীর্ঘস্থায়ী হতো না। সম্ভবত সুমেরু অঞ্চলে পাথর দুষ্প্রাপ্য ছিল। তবে তাদের নগর পরিকল্পনা ছিল খুবই নিখুঁত। দালানের দেয়াল ইটের তৈরি হলেও ছাদ ছিল কাঠের দ্বারা তৈরি। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি জিগুরাত নামক ধর্মমন্দির। প্রায় প্রতি নগরেই এরূপ জিগুরাত নামক ধর্মমন্দির বা ইমারত তৈরি হয়েছিল। সুমেরীয়দের অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল গণিত পদ্ধতি, গুণভাগ নির্ণয়, চন্দ্রভিত্তিক বর্ষপঞ্জি তৈরি, পানি দ্বারা চালিত এক ধরনের ঘড়ি।

MCQ বোর্ড প্রশ্ন

সুমেরীয়দের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগুরাত' ছিল-

i. ধর্ম মন্দির

ii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

iii. চিকিৎসালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

Answer: A. i ও ii

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

(ক) কোন অঞ্চলে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ?

খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়?

কিউনিফর্ম হলো সুমেরীয়দের আবিষ্কৃত লিখন পদ্ধতি।

সভ্যতার প্রথম দিকে সুমেরীয় লিপি ছিল মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপিভিত্তিক। পরবর্তীকালে নিজেদের লেখাকে গতিশীল করতে তারা নতুন লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে, যা 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform script) বা কীলকাকার নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা কাদামাটির প্লেটে খাগের কলম (Reed Pen) দিয়ে কৌণিক কিছু রেখা ফুটিয়ে তুলত। খাঁজকাটা চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা ছিল তীরের মতো। কিউনিফর্মকে বলা হয় অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপি। এ-লিপি বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হতো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

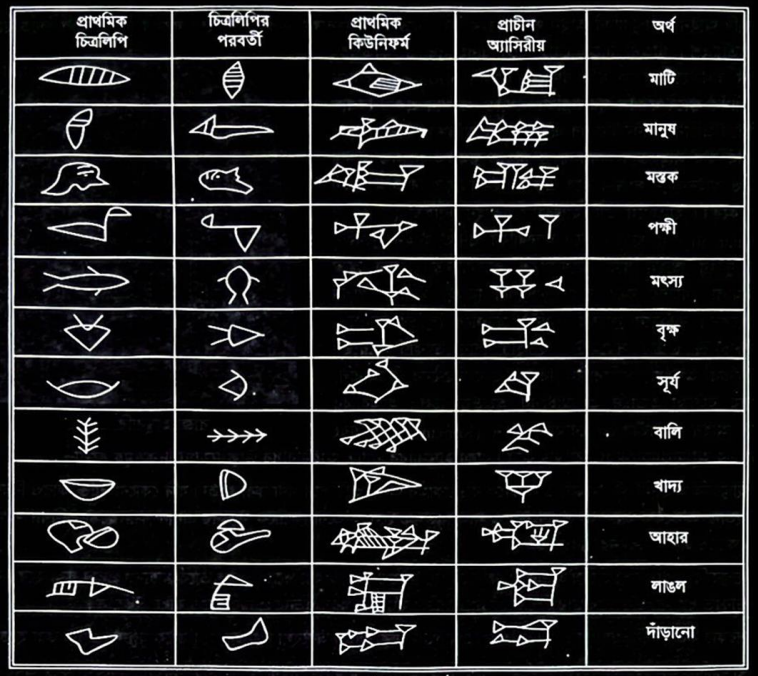

প্রাথমিক চিত্রলিপি	চিত্রলিপির পরবর্তী	প্রাথমিক কিউনিফর্ম	প্রাচীন অ্যাসিরীয়	অর্থ
				মাটি
				মানুষ
				মস্তক
				পক্ষী
				মৎস্য
				বৃক্ষ
				সূর্য
				বালি
				খাদ্য
				আহার
				লাঙল
				দাঁড়ানো

চিত্রলিপি থেকে কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তন

ক. পিরামিড কী?

খ. মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের চিত্র কোন সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন কর।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ০৪ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৬ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৭ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

Bab-il অথবা বাব-ইল শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার জনক ছিল সেমিটিক জাতি। এ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার গড়ে তোলে অ্যামোরাইট নামক সেমিটিক জাতি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সেমিটিক জাতির অবদান সর্বাধিক। প্রকৃতপক্ষে সুমেরীয় রাজা ডুঙ্গির মৃত্যুর পর পরই সুমেরীয় সভ্যতার পতন ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য বা সভ্যতা। অ্যামোরাইটরা আরব মরুভূমির উত্তরাঞ্চল থেকে মেসোপটেমিয়ায় এসে ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে সভ্যতা গড়ে তোলে। এ সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলা হয়।

মূলত ব্যাবিলনীয় সভ্যতা চরম খ্যাতি অর্জন করে বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবির শাসনামলে। তিনি ছিলেন অ্যামোরাইট জাতির বিখ্যাত নেতা। ব্যাবিলনে বসতি স্থাপনকারী অ্যামোরাইটদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি তেমন উন্নত ছিল না। ব্যাবিলনে রাজ্য স্থাপন করে তারা পূর্বের সুমেরীয় সভ্যতার সবকিছুই গ্রহণ করে। হাম্মুরাবির 'আইন সংহিতা' ছিল জগদ্বিখ্যাত। পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রভূত সাধন করে।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

নব্য ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য : হাম্মুরাবির মৃত্যুর পর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব হয়নি বেশিদিন। এ সময় সুমেরীয় অঞ্চল আবার অনেকগুলো ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিষ্ঠুর সামরিক নীতি প্রয়োগ করে মেসোপেটেমিয়ায় বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তারা।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে এ অঞ্চলে উত্থান ঘটে অ্যাসিরিয়ানদের। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে অ্যাসিরিয়ানদের পরাজিত করে সামন্তরাজা নেবুচাঁদনেজার ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সাম্রাজ্য 'নব্য ব্যাবিলনীয়' সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন নেবুচাঁদনেজার। জেরুজালেম বিজয়ী এ রাজা রানির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নগর দেয়ালের উপরে এক মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন। এ উদ্যানই বিশ্বখ্যাত 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' বা 'ঝুলন্ত উদ্যান' নামে পরিচিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম হিসেবে পরিচিত 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান।'

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

হাম্মুরাবি আইন : হাম্মুরাবির আইন অনুসারে খাজনা দিতে হতো ফসলের এক-তৃতীয়াংশ; ফলের বাগান হলে দিতে হতো দুই-তৃতীয়াংশ। খাজনা দিতে দেরি হলে এবং সুদ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যর্থ হলে তাকে দাস বানানো হতো। ১৯০১-০২ খ্রিষ্টাব্দে সুসা নামক স্থানে ফরাসি পুরাতত্ত্ববিদ এম.ডি. মরগান একটি বিশাল শিলাখণ্ডে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের একটি লিপি আবিষ্কার করেন। রাজা হাম্মুরাবি স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার্থে প্রচলিত স্থানীয় নীতি ও আইনকানুন সংস্কার করে একটি সর্বজনস্বীকৃত বিধিবদ্ধ আইন তৈরি করেন। ইতিহাসে এটি হাম্মুরাবির 'আইন সংহিতা (Code of Hammurabi) বলে খ্যাত। তবে হাম্মুরাবির প্রণীত আইন সুমেরীয় রাজা ডুঙির আইন দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত। প্রস্তর স্তম্ভে বিধানমালা খোদিত করে রাজা হাম্মুরাবি বিভিন্ন মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস জাদুঘরে (ল্যুভর জাদুঘর) সংরক্ষিত এ স্তম্ভের সর্বমোট ২৮২টি বিধি উৎকীর্ণ রয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধ, পারিবারিক বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মাবলি, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি এ আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাম্মুরাবির প্রণীত আইন পরবর্তীকালে রোমান আইন (Roman Law) এবং পাশ্চাত্যের আইনকানুনকে প্রভাবান্বিত করে। রাজা হাম্মুরাবির প্রণীত আইনবিধির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো–

রাজা হাম্মুরাবি

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

পাশ্চাতের আইনকানুনকে প্রভাবান্বিত করে। রাজা হাম্মুরাবির প্রণীত আইনবিধির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো–

- হাম্মুরাবি আইনে মিথ্যা মামলা ও সাক্ষ্যকে বড় রকমের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। যদি কোনো ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে তা প্রমাণ করতে না পারত, তাহলে অভিযোগকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো। মিথ্যা সাক্ষীর ক্ষেত্রেও এরূপ বিধানের ব্যবস্থা ছিল।
- হাম্মুরাবি আইনে বলা হয়, যদি ডাকাতি করতে গিয়ে কোনো ডাকাত ধরা পড়ে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। যদি ডাকাত ধরা না পড়ে তবে ডাকাতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সব ক্ষতিপূরণ গভর্নর প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।
- সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতেন তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো।
- হাম্মুরাবির আইনে সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি পরিখা খনন, সেচ ব্যবস্থায় অবহেলা করে এবং এর ফলে পার্শ্ববর্তী কোনো জমির ক্ষতি হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি ঐ ব্যক্তি দিতে বাধ্য থাকবে।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

ব্যাবিলনীয়দের ধর্ম বিশ্বাস : ব্যাবিলনীয়রাও অন্যান্য সভ্যতার মতো দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় বিশ্বাসী ছিল। মারডক (Marduk) নামক সূর্যদেবতার পূজা ব্যাবিলনীয় সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা প্রণয়ের দেবী ইসতার, বায়ুর দেবতা মারুসহ অসংখ্য নগর দেবতা ও ছোটখাটো দেবদেবীর পূজা করত। ব্যাবিলনীয়দের অশরীরী প্রেতাত্মার শক্তিতেও তারা বিশ্বাসী ছিল।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

ব্যাবিলনীয়দের শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা : প্রাচীন ব্যাবিলনীয় আলাদা কৃতিত্বের দাবিদার ছিল শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে। তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল এবং তাদের ভাষার ৩৫০টি ধ্বনি চিহ্ন ছিল। শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাবিলনীয় সমাজে এক ধরনের শিক্ষালয় চালু ছিল। সেখানে নরম ও ভিজা কাদার মধ্যে কাঠি দিয়ে লেখার লিখন পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। একে কিউনিফর্ম বা 'কিলকাকার লিখন পদ্ধতি' বলা হয়। লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই ছিল এ শিক্ষালয়ের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হতো। বিদ্যালয়ের দেয়ালে লেখা হতো 'লিখন পদ্ধতিতে যে উৎকর্ষতা অর্জন করবে, সে সূর্যের ন্যায় কিরণ দেবে'। সুমেরীয় সভ্যতার ন্যায় ব্যাবিলনীয় সমাজেও সাহিত্যচর্চা ছিল। সুমেরীয়দের 'গিলগামেশ' উপাখ্যানের উৎস থেকে ব্যাবিলনীয় কবি-সাহিত্যিকগণ অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেন।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

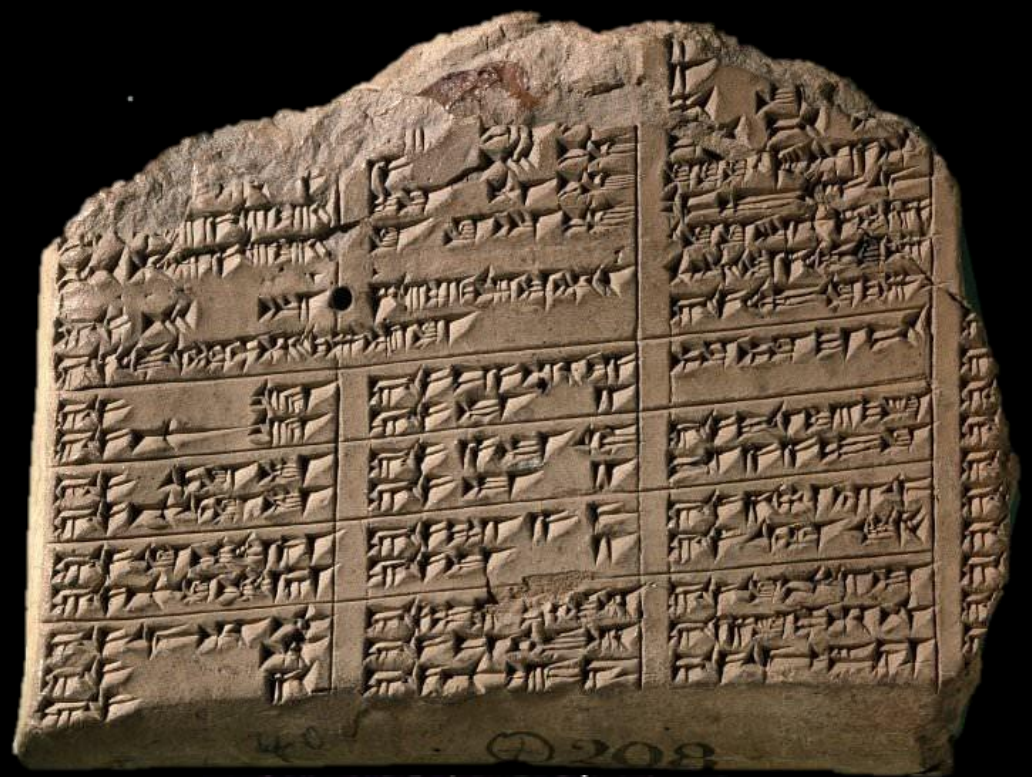

চিত্রলিপি থেকে কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তন

প্রাথমিক চিত্রলিপি	চিত্রলিপির পরবর্তী	প্রাথমিক কিউনিফর্ম	প্রাচীন অ্যাসিরীয়	অর্থ
				মাটি
				মানুষ
				মস্তক
				পক্ষী
				মৎস্য
			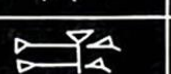	বৃক্ষ
				সূর্য
	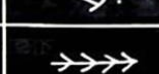			বালি
	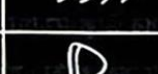			খাদ্য
				আহার
				লাঙল
				দাঁড়ানো

চিত্রলিপি থেকে কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তন

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

ব্যাবিলনীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা : ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। সে সময় ব্যাবিলনের ৫৫০ রকমের ওষুধের প্রচলন ছিল। ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন। তারা তারকামণ্ডল, সূর্য ও রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এবং এ সম্বন্ধে যুক্তিসংগত ধারণাও লাভ করেছিল। গণিতশাস্ত্রে ব্যাবিলনীয়রা ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। দশমিকের প্রচলন, বীজগণিতে সরল সমীকরণ, পরিধি, ব্যাসের অনুপাতের মানস্থিত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। জ্যোতিষিগণ এক ধরনের জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির আবিষ্কার ও ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল। এছাড়া বর্ষপঞ্জিকাকে বছর, মাস ও দিনে বিভক্ত করে ব্যবহার করার কৌশলও তারা আবিষ্কার করে।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

ব্যাবিলনীয়দের ভাস্কর্য : ব্যাবিলনীয়রা ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি লাভ করেছিল এবং বিভিন্ন পাথরের স্তম্ভে ব্যাবিলনীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে চুনাপাথরের স্তম্ভে শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং নকশাকৃত পোশাকে হাম্মুরাবিকে খোদিত করা হয়েছে। এছাড়া হাম্মুরাবির ২৮২টি আইন নিখুঁত ও বিন্যাসকৃত পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এভাবে ভাস্কর্য শিল্পে ব্যাবিলনীয়রা অনবদ্য অবদান রেখে গেছে।

MCQ বোর্ড প্রশ্ন

সঙ্কট সমাধানে উপরিউক্ত জ্ঞান কোন সভ্যতায় প্রথম ব্যবহার হয়?

ক) সুমেরীয়

খ) মিশরীয়

গ) আসিরীয়

ঘ) ব্যাবিলনীয়

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

(ক) কোন শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি?

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ০৫ অ্যাসিরীয় সভ্যতা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অ্যাসিরীয় সভ্যতা

ব্যালিনীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল অ্যাসিরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কারণ ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অ্যাসিরীয় সভ্যতা সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতা থেকে অনেক বেশি ধার করেছিল। অ্যাসিরীয়রা অন্যান্য সভ্যতার অনুকরণ করেছে সত্য, তবে কিছু ক্ষেত্রে যেমন– ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে তারা মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেনাচেরিব নামক একজন অ্যাসিরীয় নৃপতি নির্মাতা হিসেবে খুবই বিখ্যাত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি অ্যাসিরিয়ার রাজধানী নিনেভা পুনঃনির্মাণ করেন। সেনাচেরিব ছাড়াও আসুরবানিপাল নামেও একজন বিখ্যাত সম্রাট অ্যাসিরীয়দের শাসন করেছিলেন। আসুরবানিপাল প্রাচীনকালের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে এক বিরাট পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এ পাঠাগার জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছিল।

অ্যাসিরীয় সভ্যতা

অ্যাসিরীয় সমাজে দাস ও নারীর অবস্থা : অ্যাসিরীয় সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে অ্যাসিরীয় দাসরা মোটামুটি ভালো অবস্থানে ছিল। অ্যাসিরীয় সমাজে নারীদের তেমন মূল্যায়ন করা হতো না। স্বামীরা ইচ্ছামতো স্ত্রী গ্রহণ এবং তালাক দিতে পারত। স্বামীরা স্ত্রীদের সাথে দাসের মতো আচরণ করত। কিন্তু অভিজাত মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ নিতে দেখা যেত। তারা পর্দাপ্রথাও মেনে চলত।

অ্যাসিরীয় সভ্যতা

অ্যাসিরীয়রা 'এশিয়ার রোমান' : অ্যাসিরীয়দের এশিয়ার রোমান বলা হয়ে থাকে। অ্যাসিরীয়রা রোমানদের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে ওঠে। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাদের এশিয়ার রোমান বলা হয়। তাছাড়া অ্যাসিরীয়দের অনেক কার্যক্রমই রোমানদের কার্যক্রমের সাথে মিলে যায়। যেমন : রোমানরা গ্রিস দখল করে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো গ্রহণ করেছিল, ঠিক তেমনি অ্যাসিরীয়রাও ব্যাবিলন অধিকার করে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল।

অ্যাসিরীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাও অনেকটা রোমানদের অনুকরণে বিন্যস্ত হয়েছিল। এসব দিক বিবেচনায় অ্যাসিরীয়দের এশিয়ার রোমান বলা হয়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ০৬ হিব্রু সভ্যতা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

হিব্রু সভ্যতা

সভ্যতার ইতিহাসে হিব্রু সভ্যতা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। পিরামিড, প্রশাসন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাস্তাঘাট বা দালান-কোঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৌলিক কৃতিত্বের ছাপ না রেখেও তারা সবকিছু ছাপিয়ে ধর্মক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ সভ্যতায় বর্তমান বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক ধর্মীয় আবেগ রয়েছে। ইসলাম, খ্রিষ্টান, ইহুদি এ তিন ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে হিব্রু সভ্যতা জড়িত রয়েছে। স্টুয়ার্ড মি. ইস্টান বলেন, "Both Christianity and Islam have adapted a considerable portion of the Hebrew religious insights as their own."

হিব্রু সভ্যতা

হিব্রু জাতির উৎপত্তি : হিব্রু একটি সেমিটিক ভাষা। এ হিব্রু ভাষাভাষীরা ইতিহাসে হিব্রু জাতি নামে পরিচিত। হিব্রু একটি ব্যাবিলনীয় শব্দ। এর অর্থ বিদেশি, নিম্নবংশীয় যাযাবর। এ শব্দটির হিব্রু ভাষার সমশব্দ হচ্ছে ইবিরি (Ibri)। এটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ অতিক্রম করা। এ থেকে মনে হয়, তারা যাযাবর জাতি অর্থাৎ অন্য কোনো স্থান হতে এসে বসতি স্থাপন করেছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, হিব্রুদের আদিবাস ছিল আরব মরুভূমি। কারও কারও মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে কেনানাইট আরব (যারা ছিল নূহ (আ.)-এর পুত্র কেনানের বংশধর) প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে। কেউ কেউ মনে করে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে ইব্রাহিমের নেতৃত্বে হিব্রুদের একটি দল এখানে বসতি গড়ে তোলে। ইহুদিরা যে প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দা নয়, তা বাইবেলের আদিগ্রন্থ Old Testament থেকে বোঝা যায়।

হিব্রু সভ্যতা

হিব্রু সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান : বর্তমান জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন হিব্রু সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত প্যালেস্টাইনের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে। দেশটির উত্তরে রয়েছে প্রাচীন ফিনিশিয়া আর বর্তমান লেবানন। এর দক্ষিণে সৌদি আরব, পূর্বে জর্ডান এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর।

হিব্রু সভ্যতা

রাজনৈতিক ইতিহাস : প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে হিব্রু সভ্যতা গড়ে ওঠে। এ সভ্যতার জনগণ হিব্রু বা ইহুদি নামে পরিচিত। তারা প্রথমে সুমেরীয়দের অধীনে ছিল। তাদের নেতা হযরত ইব্রাহিম (আ.) বা আবরাহাম ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বে তার অনুসারীদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় চলে যান। পরবর্তীতে আবরাহামের বংশধর ইয়াকুব (আ.) বা জ্যাকব হিব্রুদের নিয়ে প্যালেস্টাইনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াকুব (আ.)-এর আরেক নাম ছিল ইসরাইল। সেই সূত্রে তার অনুসারীরা ইসরাইলি নামে পরিচিত। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ১২ পুত্রের একজনের নাম ছিল জুদা বা ইয়াহুদা। এই ইয়াহুদার নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয় ইহুদি। খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে হিব্রুরা মিশরের ফারাও সম্রাটদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ১৩০০-১২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হযরত মুসা (আ.) বা মোজেস-এর নেতৃত্বে তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে সিনাই উপদ্বীপে এসে নতুন বসতি গড়ে তোলে। হযরত মুসা (আ.) তাদের একেশ্বরবাদী নিজেকে জেহোভার (Jehovah) উপাসনায় আকৃষ্ট করেন। কিন্তু মুসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর পুনরায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

হিব্রু সভ্যতা

১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ডেভিড বা হযরত দাউদ (আ.) হিব্রুদের সংঘটিত করে ত্রিশ বছর বয়স থেকে একটানা ৪০ বছর রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকাল অত্যন্ত গৌরবময়। তিনি হিব্রুদের দশটি গোত্রকে একত্রিত করে একটি মহান জাতিতে পরিণত করেন। প্যালেস্টাইন, ফিলিশীয়া, আরামাইনসহ দক্ষিণ সিরিয়া তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। জেরুজালেম রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। দাউদ (আ.) একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর সলোমন বা হযরত সোলায়মান (আ.) হিব্রু জাতির নেতৃত্ব লাভ করেন।

সলোমনের রাজত্বকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরম সমৃদ্ধি লাভ করে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি তিনি সাম্রাজ্যকে ১২টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে তিনি সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি জেরুজালেমে বায়তুল মুকাদ্দাস (মসজিদুল আল আকসা) নির্মাণ করেন। ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্যালডীয় রাজা নেবুচাঁদনেজারের জুডাহ অধিকারের মধ্য দিয়ে হিব্রু সভ্যতার পতন ঘটে।

হিব্রু সভ্যতা

হিব্রুদের ধর্ম : পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হিব্রুরা একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রবর্তনে সক্ষম হয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) ইসলামের ভাষায় তৌরাত তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম। পবিত্র কুরআন শরিফের বর্ণনায় হযরত দাউদ (আ.)-এর সম্পর্কে অনেক তথ্য দেখা যায়। হিব্রুদের মধ্যে জাদুটোনা, জেহোবা দেবতাই একমাত্র ঈশ্বর ইত্যাদি কুসংস্কার ছিল। প্রকৃতি পূজা বিশেষ করে গাছ, কুয়া, পাহাড়-পর্বত, নদী-ঝরনা ইত্যাদি পূজার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন জীবজন্তু বলি দেওয়া তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গে পরিণত হয়। আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবিগণ তাদের সকল পূজা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকে একেশ্বরের প্রতি আহ্বান জানান।

হিব্রু সভ্যতা

সভ্যতায় হিব্রুদের অবদান

হিব্রুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও চিত্রকলা : বিজ্ঞানে তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কোনো আবিষ্কার নেই। কোনো অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকেও তারা গ্রহণ করেনি। স্থাপত্যিক দক্ষতাও তেমন দেখা যায় না। চিত্রশোভিত কিছু সিল তারা ব্যবহার করত। তাদের সাহিত্যকর্ম 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এবং 'অ্যাপক্রিপায়' (Apocryphal) লিপিবদ্ধ রয়েছে। হযরত মুসা (আ.)-এর অনেক বাণী ওল্ড টেস্টামেন্টে সংগৃহীত করা হয়েছে। উইজডম অব সোলোমন একটি শ্রেষ্ঠ ইহুদি সাহিত্য গ্রন্থ। এছাড়া 'সোলোমানের গীতিকা' (Songs of Soloman) হিব্রু জাতির জনপ্রিয় গীতিকা। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testment)-এর দ্বিতীয় পুস্তক (The Book of Exodus) ছিল মূলত মুসা (আ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত। ষষ্ঠ পুস্তকটি (The Book of Joshus) মহাকাব্যের মানসম্মত ছিল। এখানে হিব্রু বীর ও জনগণের ঘটনাবহুল জীবন কাহিনি বিবৃত হয়েছে। অষ্টম পুস্তকে (The Book of Ruth) নারীদের অবস্থান ও চরিত্র করুণ রসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। জেরুজালেম রাজা সোলোমানের নির্মিত 'হেরোদ' মন্দির স্থাপত্য এবং ১৯৪৭ সালে আবিষ্কৃত পুঁথি ডেড সি স্ক্রল (Dead Sea Scroll) বা মরু সাগরের দস্তাবেজ'-এ হিব্রুদের চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিব্রু সভ্যতা

সভ্যতায় হিব্রুদের অবদান

হিব্রু দর্শন : গ্রিকদের পূর্বে হিব্রুরা বিস্ময়কর দর্শনের জন্ম দিতে পেরেছিল। এ দর্শন মানুষ ও জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছিল। পুরাতন টেস্টামেন্টে তাদের অনেক দার্শনিক মতবাদ পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে। Book of Proverbs এবং 'Apocryphal Book of Ecclesiasticus' এবং পুরাতন টেস্টামেন্টের এই দুই অংশে হিব্রুদের প্রাথমিক দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে।

হিব্রু সভ্যতার প্রভাব : শিল্পকলায় হিব্রুদের উল্লেখযোগ্য অবদান না থাকলেও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের বহুবিধ অবদান রয়েছে। শুধু খ্রিষ্টধর্মই নয়, পশ্চিমা জগতে আধিপত্য বিস্তারকারী সকল ধর্ম হিব্রুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ষোলো শতকের প্রতি সংস্কার বিপ্লবিগণ ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু অনুশাসন ও আইন দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম বিশ্বজুড়ে এক ঈশ্বরের আরাধনার যে কথা প্রচার করছে তার শুভ সূচনা করেছিল এই হিব্রু জাতি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ০৭ গ্রীক সভ্যতা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে নদীর বদলে সাগরতীরে। গ্রিক সভ্যতা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি। গ্রিক নামটি রোমানদের দেওয়া নাম। আধুনিককালে দেশটি গ্রিস এবং দেশের অধিবাসী ও তাদের ভাষা গ্রিক নামে পরিচিত। গ্রিসের রাজনৈতিক একক হিসেবে পলিস (Polis)-এর আবির্ভাব এবং গণতান্ত্রিক ধারণা নেতৃত্ব নিয়ে নগররাষ্ট্র এথেন্সের সাফল্য গ্রিক সভ্যতাকে আলোচনায় এনেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অঞ্চলে বিভক্ত দেশটির অন্যান্য নগররাষ্ট্রের কোথাও দেখা যায় স্বৈরাচারী বা একনায়কতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। সামরিকতন্ত্রের কাঠামোর ওপর অপর নগররাষ্ট্র স্পার্টায় গড়ে ওঠে রাজতন্ত্র। এ সভ্যতা বিকাশে সমুদ্র অপরিসীম অবদান রাখে।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক জাতির উৎস : আরব মরুভূমির সীমান্তরেখায় দক্ষিণাঞ্চলীয় তৃণভূমিতে সেমিটিক গোষ্ঠী এবং উত্তরাঞ্চলীয় ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রথম শাখাটি ভারতে এবং অপর শাখা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ কিংবা ৩০০০ অব্দে দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে বলকান উপদ্বীপে পৌঁছে। বলকান উপদ্বীপে বসবাসকারী ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী গ্রিক রোমানদের পূর্বপুরুষ। গ্রিকরা নিজেদের মনে করত ন্যায়পরায়ণতার দেবতা ডিয়োকেলিয়ন (Deucalion)-এর পুত্র হেলেনের (Hellen) বংশধর। এ সভ্যতার সময়সীমা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দ পর্যন্ত! হেলেনের বংশধর মনে করে গ্রিকরা নিজেদের হেলেনীয় বলত। এ থেকে মূল গ্রিক সভ্যতা হেলেনীয় সভ্যতা নামেও খ্যাতিলাভ করে।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক নগররাষ্ট্রের উত্থান : গ্রিসে শত শত দ্বীপ ছিল। একটি দ্বীপের সাথে অন্য দ্বীপের তেমন যোগাযোগ ছিল না। তাই গ্রিকদের আঞ্চলিকতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা ছিল প্রবল। স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে হোমারীয় যুদ্ধ শেষে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে স্বাধীন নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে। বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল এথেন্স ও স্পার্টা। গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ছিল এথেন্স এবং অভিজাততান্ত্রিক রক্ষণশীল, পশ্চাৎমুখী এবং অনুন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ছিল স্পার্টা। তবে এর পিছনে রাজনৈতিক বিবর্তন ছিল। দুই-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকল নগররাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিবর্তনের ধাপ ছিল প্রায় একই রকম। প্রথম ধাপে ছিল রাজতান্ত্রিক শাসন, এরপর অভিজাততান্ত্রিক শাসন ও একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী শাসন। সবশেষে ষষ্ঠ ও পঞ্চম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিসের একটি অংশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের আলোচনা সম্ভব না হওয়া স্পার্টা ও এথেন্সের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

গ্রীক সভ্যতা

নগররাষ্ট্র স্পার্টা : স্পার্টা শব্দের অর্থ কর্ষিত বা বোনা জমি। স্পার্টার জাতীয় চরিত্র ছিল অভিজাততান্ত্রিক এবং কখনো কখনো স্বৈরতান্ত্রিক। পুরো নগররাষ্ট্রটি যেন সামরিক ছাউনি ছিল। স্পার্টা একসময় মাইসেনিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পেলোপনেসাস অঞ্চলের পূর্বদিক থেকে স্পার্টারা এসে এ অঞ্চল দখল করে নেয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধ করার ফলে তাদের জাতীয় স্বভাব হয়ে যায় যোদ্ধা হিসেবে। যুদ্ধবন্দিদের ভূমিদাস বানানো হতো, যা হেলট (Helot) নামে পরিচিত ছিল। দুর্বল ও অসুস্থ শিশু ছাড়া সবার জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক নগররাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : গ্রিক নগররাষ্ট্র আয়তনে ছিল ছোট। বড় জোর ১০০ মাইল। অধিকাংশ রাষ্ট্র ছিল পাহাড়-পর্বত দ্বারা বেষ্টিত এবং সমুদ্র উপকূলে অর্থাৎ আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগরের কোল ঘেঁষে এসব নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এসব নগররাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

১. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা ছিল সীমিত ১০/১৫ হাজার থেকে ৬০/৭০ হাজার। বড় রাষ্ট্রগুলোর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা এ ধরনের বিশাল আয়তনের নগররাষ্ট্র ছিল। স্পার্টার পরিধি ছিল চার হাজার বর্গমাইল এবং এথেন্সের এক হাজার বর্গমাইল।

২. প্রতিটি নগররাষ্ট্র ছিল এক একটি উপনিবেশ এবং সমস্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

৩. নগররাষ্ট্রে স্থান সংকুলান না হলে তারা বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলে উপ-নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে। ইজিয়ান সাগরে এ ধরনের উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

৪. নগররাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃকলহ ও সংঘাত থাকলেও বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা একতাবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করত।

৫. নগররাষ্ট্রসমূহে প্রথমদিকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে সেগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. এথেন্সের মতো স্পার্টায় গণতন্ত্রের স্থলে স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কত্ব বিরাজ করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে না পারলেও যুদ্ধবিদ্যা ও খেলাধুলায় স্পার্টার অধিবাসিগণ পারদর্শী ছিল।

৭. স্পার্টা মূলত ছিল একটি সামরিক রাষ্ট্র এবং প্রতি পুরুষ সন্তানকে ৭ বছর বয়সে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হতো বাধ্যতামূলকভাবে।

৮. গ্রিক নগররাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতীয় ঐক্য রক্ষার্থে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান যা অলিম্পিক নামে পরিচিত।

গ্রীক সভ্যতা

গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স : খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম-৭ম শতাব্দীতে গ্রিসে এথেনীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। পৃথিবীতে এথেন্স নগররাষ্ট্রে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয়। অবশ্য এ গণতন্ত্রের ফসল একদিনে আসেনি। এথেন্সবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে এ গণতন্ত্রের সূচনা। এথেন্সের অধিবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।

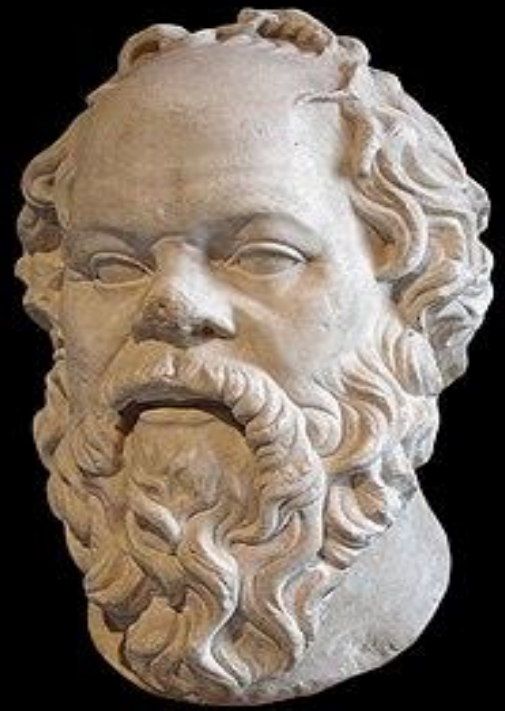
সক্রেটিস

অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলেন উচ্চশ্রেণির অধিবাসী। অভিজাতবর্গ ছাড়া স্বাধীন এথেন্সবাসীদের বলা হতো ফেমোস। দাস শ্রেণির লোকেরা ছিলেন সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণির লোক । ফেমোস ও অভিজাত সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ফলেই এথেন্সে গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে দাসদের কোনো সুযোগ ছিল না। প্রথমে এথেন্সে রাজার হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল। পরে তিনি অভিজাতবর্গ এবং পুরোহিতদের নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ শাসনব্যবস্থাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন বা উত্তম লোকদের শাসন বলা হতো। গোত্রপ্রধান বা মোড়লদের পরামর্শে সভ্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নয় জন প্রশাসন নির্বাচিত করত এবং তারাই এথেন্সবাদীদের শাসন করত। ক্রমান্বয়ে এ অভিজাতবর্গের শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। গ্রিসের জনসাধারণ ফেমোস অধিকারের জন্য সচেতন হয়ে ওঠে।

গণঅভ্যুত্থানের ফলে ভীত অভিজাত শ্রেণি ফেমোসের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দে সোলোন এথেন্সের শাসনকর্তা নির্বাচিত হলেন। তিনি ছিলেন নিম্ন অভিজাত শ্রেণির লোক। তিনি সাহসী যোদ্ধা, কবি ও বাগ্মী ছিলেন ।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক সরকারব্যবস্থা : স্পার্টায় ক্ষমতার ভারসাম্যমূলক সরকারব্যবস্থা ছিল। ভিন্ন পরিবারের দুইজনকে রাজা হিসেবে নিয়োগ করা হতো। দুই রাজা ও ৬০ বছরের অধিক বয়সের ২৮ জন ব্যক্তি নিয়ে কাউন্সিল গঠন করা হতো। যোদ্ধাদের নিয়ে এসেমব্লি গঠিত হতো। এসেমব্লি·এফর (Ephor) পদবিধারী ৫ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করত। দুই রাজা রাষ্ট্রের সামরিক, ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ের নেতৃত্ব দেবেন। দুই রাজা ও ২৮ জন সদস্য মোট ৩০ সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম, এসেমব্লি আহ্বান এবং ফৌজদারি কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করত। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সম্পত্তি বণ্টন, নাগরিকদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি এফরগণ দেখতেন।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক সমাজব্যবস্থা : স্পার্টার উৎকর্ষের যুগের চার লাখ নাগরিক মূলত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। বিজেতা হিসেবে আগত স্পার্টারা ছিল প্রথম শ্রেণির নাগরিক। তারা বিশ ভাগের এক ভাগ না হলেও এদের হাতেই সমুদয় রাজনৈতিক অধিকার ছিল। তারা ছিল সকল কৃষি জমি ও খামারের মালিক। দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে বসতি স্থাপনকারী অধিবাসীবৃন্দ। এদের বলা হতো পেরিওয়েসি (Perioeci)। তারা তৃতীয় শ্রেণি অপেক্ষা একটু বেশি সুযোগ-সুবিধা পেত। তৃতীয় ও সর্বনিম্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। এরা ছিল স্পার্টার আদিম অধিবাসী ও তাদের বংশধর। এক কথায় তাদের সকল অধিকার সম্পর্কে বলা যায়, তারা ছিল প্রথম শ্রেণির নাগরিকদের কিংবা প্রভুদের পণ্য।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিকদের সমরনীতি : গোটা স্পার্টা নগররাষ্ট্র যুদ্ধ শিবিরের মতো ছিল। তাদের সকল জীবন সমরনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। সুস্থ, সবল, সতেজ শিশুকে রাষ্ট্রের সম্পদ মনে করা হতো। সাত বছরের শিশুরা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যারাকে অবস্থান করত। শীতে, গরমে, আঘাতে, শারীরিক কসরতের মাধ্যমে তাদের সাহসী, উদ্যমী ও কষ্টসহিষ্ণু জাতি হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হতো। বিশ থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কাজ করতে বাধ্য করানো হতো।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিকদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : ভূমিদাস ও জমি প্রথম শ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। এসব জমির আয়ের বেশিরভাগ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় হতো। অত্যাচারিত ভূমিদাসরা ছিল উৎপাদনের মূল শ্রমশক্তি। তারা (ভূমিদাসরা) মাঝে মাঝে তাদের প্রভুদের প্রতি সশস্ত্র ঘৃণা প্রকাশ করত। এ কারণে অন্যান্য শিল্পকারখানার তেমন প্রসার ঘটেনি।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রিসের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ধারায় এথেন্স সভ্যতার চূড়ায় তখন স্পার্টা সামরিক বেড়াজালে নিজেদের বন্দি করে পশ্চাৎমুখে ধাবমান।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক দর্শন : গ্রিকরা বিশ্বকে একটি সমৃদ্ধ দর্শন উপহার দেয়। প্রাক-সক্রেটিস যুগে দর্শন ছিল বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যা। কীভাবে পৃথিবী অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে এবং কীভাবে এর পরিবর্তন হচ্ছে এর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রদান ছিল গ্রিক দর্শনের মূল বিষয়বস্তু। গ্রিক দার্শনিক থ্যালিস (Thales) সর্বপ্রথম খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৫ অব্দে সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, সবকিছুর সৃষ্টির মূলে রয়েছে পানি। গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ, পৃথিবী ইত্যাদির উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মতে, কোনো বক্তব্যই চূড়ান্ত বা চিরসত্য নয়। তাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পদ্ধতি গ্রিকদের বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথ দেখায়। সফিস্ট চিন্তার অন্যতম পুরোহিত সক্রেটিসের মূলকথা ছিল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে প্রত্যেকটি বস্তু যাচাই করে আবেগ বর্জন করে ভালোটুকু গ্রহণ করতে হবে। ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সক্রেটিসকে বিষপানে হত্যা করা হয়। প্লেটো (৪২৭–৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সক্রেটিসকে বিষপানে হত্যা করা হয় । প্লেটো (৪২৭–৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) 'The Republic' গ্রন্থে শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের দর্শনচিন্তা লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি মোট ৩৬টি গ্রন্থ দর্শন বিষয়ে রচনা করেন। দর্শনশাস্ত্রের আরেক দিকপাল এরিস্টটল 'The Politics' ও অন্যান্য গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রিক দর্শনকে সমৃদ্ধ করেন।

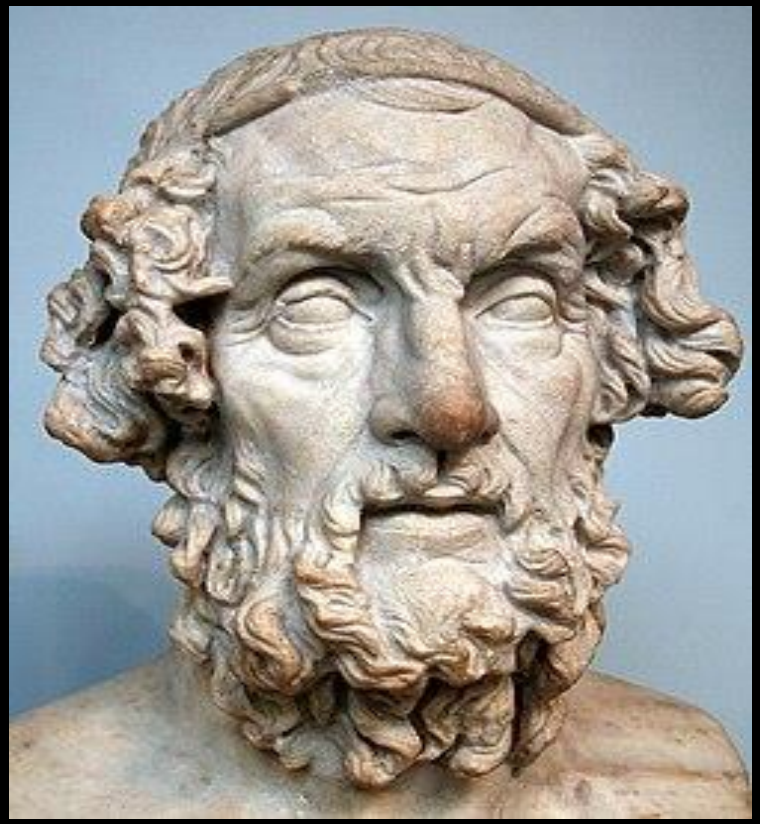

হোমার

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক সাহিত্য : প্রাচীন গ্রিকরা সাহিত্যচর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছে। রহস্যময় ব্যক্তিত্ব ও অন্ধ কবি হোমার খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকে তার বিখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়ড (Illiad) ও ওডেসি (Odyse) এর মাধ্যমে গ্রিকদের ঐতিহ্যের কাহিনি কিংবদন্তি দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রিক সমাজ, গ্রিকদের আদর্শিক, অতীত ইতিহাস, গ্রিক কর্তৃক ট্রয় নগরীর ধ্বংসের কাহিনি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে গ্রিক সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। (Hesiod খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫); গীতিকবি সাপ্পো (Sappho) (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক), কবি পিন্ডার (Pindar), বিখ্যাত ও সৃজনশীল নাট্যকার সফোক্লিস (৪৯৬-৪০৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) প্রমুখ কবি ও নাট্যকার গ্রিকদের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সমাজজীবন, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি দিক তুলে ধরেছেন।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক ক্রীড়া : সব নগররাষ্ট্রকে একত্রিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচীন গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে অলিম্পিক খেলার সূচনা হয় । প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করত। ফলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক ইতিহাস : গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসকে (Herodotus খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৪-৪৩০ অব্দ) ইতিহাসের জনক বলা হয়। সর্বপ্রথম তিনিই History বা ইতিহাসকে অনুসন্ধান অর্থে ব্যবহার করেন। তার 'History of the Person War's একটি ইতিহাস গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস হিসেবে অভিহিত হয়। তার রচিত ৯টি খণ্ডে পর্যায়ক্রমে সম্রাট সাইরাস, মিশর, পারস্যের অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও সম্রাট দারিয়ুসের ক্ষমতায় আরোহণ, সাই ইয়া-এর বাসস্থান, আইওনিয়ান বিদ্রোহ, ম্যারাথন যুদ্ধ, পারসিয়ান সম্রাট জারেক্সেম কর্তৃক গ্রিস আক্রমণ ও থার্মোপিলের যুদ্ধে তার সামরিক সাফল্য, সালামিসের যুদ্ধ ও গ্রিকদের ভাগ্যবিপর্যয় এবং সবার শেষে নবম অধ্যায়ে পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রিকদের বিজয়ের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। অপর বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস (Thukydides ৪৬০-৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব) তার 'History of the Peolponnesian War' পোলোপনেশীয় যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে অমর হয়ে রয়েছেন। যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রামাণিকভাবে ইতিহাস রচনার জন্য তাকে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক বলা হয়।

গ্রীক সভ্যতা

গ্রিক বিজ্ঞান : বিজ্ঞানে গ্রিকদের মৌলিক অবদান রয়েছে। থ্যালিস (Thales ৪২৬ - ৫৪৮ খ্রিষ্টপূর্ব) সূর্য গ্রহণের সময় নিরূপণ করে প্রমাণ করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই সূর্য গ্রহণ হয়ে থাকে। গণিতবিদ পিথাগোরাস (Pythagoras- খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) জ্যামিতির উন্নয়নে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন, পৃথিবী বৃত্তাকার। তার সূত্র আজও গুরুত্বের সাথে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এনাক্সোগোরাস (Anaxagoras) প্রথম ধারণা দেন যে, সূর্য হচ্ছে উত্তপ্ত ও গলিত পাথরের পিণ্ড এবং চন্দ্র সূর্যের আলোতেই আলোকিত। হিপোক্রাটস একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন।

গ্রীক সভ্যতা

সভ্যতায় গ্রিকদের প্রভাব : গ্রিক সভ্যতার কাছে আধুনিক বিশ্ব বিভিন্নভাবে ঋণী । এথেন্স রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনে অগ্রজের ভূমিকা পালন করেছে। সর্বসাধারণের মত প্রকাশের সুযোগ দিলে যে রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়, তা গ্রিক সভ্যতায় প্রমাণিত। সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এ সভ্যতার মাধ্যমে জানা যায়। এছাড়া দ্শৰন, বিজ্ঞান, ভাস্কর্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান অবিনশ্বর। বিশ্ববাসী যতই সভ্যতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করুক না কেন, শিকড়ের সন্ধান খুঁজতে গিয়ে গ্রিক সভ্যতায় অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। গ্রিসের অলিম্পিক খেলা সরাসরি আধুনিক বিশ্ব কর্তৃক গৃহীত হয়েছে ।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

গ্রিক সভ্যতার প্রধান দেবতা কোনটি?

ক) জিউস খ) অ্যাপোলো

গ) অ্যারেস ঘ) পসেইডন

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

গ্রিক সভ্যতার প্রধান খেলাধুলা কোনটি?

ক)অলিম্পিক
খ) প্যানথেনিক
গ)দিওনিসিয়ান
ঘ)অ্যাথলেটিক

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ০৮ রোমান সভ্যতা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

রোমান সভ্যতা

আধুনিক ইউরোপ মহাদেশের ইতালি ও তার রাজধানী রোমকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পুরোপলীয় যুগে রোমে মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। নবোপলীয় যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন থেকে মানুষের আগমন ঘটে। ব্রোঞ্জ যুগে ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী আসার ফলে সভ্যতার চাকা দ্রুত চলতে থাকে। কারণ তারা দুই চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন শুরু করে। এভাবেই বিশ্বসভ্যতায় রোমানরা নিজেদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

রোমান সভ্যতা

ভৌগোলিক অবস্থান : রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠার পিছনে ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপ মহাদেশস্থ ইতালির পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছোট শহর রোমকে কেন্দ্র করে এ সভ্যতা গড়ে ওঠে। এর পশ্চিমে রয়েছে আপেনাইন পর্বতমালা, উত্তরে আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তর-পূর্বে অড্রিয়াটিক সাগর রোম নগরী সাতটি পার্বত্য টিটার উপর ছড়িয়ে রয়েছে। তাই এ নগরী সাতটি পাহাড়ের নগরী (The city of seven hills) নামেও অভিহিত।

রোম নগরীর পত্তন : প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী উত্তর ইতালিতে বসতি গড়ে তোলে। তারা এবং তাদের ভাষা ল্যাটিন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ গোষ্ঠীর একজন রাজা রোমিউলাস (Romulus) রোম নগরীর পত্তন করেন বলে ধারণা করা হয়। তার নামানুসারে নগরীর নাম দেওয়া হয় রোম। আবার রোমান কিংবদন্তি অনুসারে রোমিউলাস ও রোমান্স নামক দুই ভাই রোম নগরীর পত্তন করেন। এ নগরী ইট্রস্কান সাগরে (Etruscan Sea) থেকে ১৪ মাইল দূরে টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাজা একাধারে সামরিক, ধর্মীয় ও আইনের প্রধান ছিলেন। তাকে সহায়তা করার জন্য দুটি কার্যকরী পরিষদ ছিল। ক. সিনেট বা বয়োজ্যেষ্ঠদের সভা (Senate or the Council of Elders) ও খ. জনগণের পরিষদ (The Popular Assembly)।

রোমান সভ্যতা

প্রজাতান্ত্রিক রোম : রোমানরা খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৯ অব্দে ইট্রুস্কান রাজা তার্কিন দ্য প্রাউড (Tarquin The Proud)-কে পরাজিত করে রাজতান্ত্রিক শাসন থেকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৫ অব্দে রোমানরা ইট্রুস্কান নিয়ন্ত্রিত শহর (Veii-ভেই) দখল করে। এরপর একে একে ইট্রুস্কান, গ্রিক ও ইতালির পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চল দখল করে। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৪ অব্দের মধ্যে রোমান প্রজাতন্ত্র গোটা ইতালির কর্তৃত্ব লাভ করে। এতে রোমানরা যোদ্ধা চরিত্র ধারণ করে এবং বিভিন্ন জাতির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী ২০০ বছর তাদের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস। যুদ্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান সংঘাত এবং পিউনিক যুদ্ধ।

জুলিয়াস সিজার

জুলিয়াস সিজার : খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪-৪৬ অব্দ পর্যন্ত রোমানদের ইতিহাস নানা গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক সংকট ইত্যাদিতে ভরপুর। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সিজার উদার একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন। তার গৃহীত সংস্কারসমূহ রোমের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি স্পেন ও ফ্রান্সে রোমান সাম্রাজ্যে আগত নাগরিককে রোমান বলে ঘোষণা দেন। স্পেন, ফ্রান্স ও উত্তর আফ্রিকায় ২০টি উপনিবেশ স্থাপন করেন। সিনেটের প্রতিনিধির সংখ্যা ৩০০ হতে ৯০০-তে উন্নীত করেন। দুস্থ নাগরিকদের সহায়তার জন্য তালিকা করেন। তার গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে রোমান সভ্যতা দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।

রোমান সভ্যতা

অগাস্টাস সিজার : অক্টোভিয়ান সিজার অগাস্টাস সিজার (Augustus Saesar) নাম নিয়ে ক্ষমতায় বসেন। সিনেটের অস্তিত্ব থাকলেও তিনি মূলত রাজতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি একাধারে কন্সাল, প্রধান সিনেটর (Princep), সামরিক বহিনীর প্রধান, ইম্পারেটর ইত্যাদি পদ গ্রহণ করে শাসনক্ষমতার সবকিছুই নিজের হাতে গ্রহণ করেন।

রোমান দর্শন : বিশ্বসভ্যতায় রোমান দার্শনিকদের অবদান অপরিসীম। পশ্চিমের সক্রেটিস নামে খ্যাত কেটো (Cato-২৩৪-১৪৯ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিলেন আদি রোমান দার্শনিক। তার মতে, গ্রিক সভ্যতা নয়, রোমান সভ্যতাই সভ্য পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করবে। তিনি সক্রেটিসের ন্যায় যুক্তি, জ্ঞান ও নৈতিকতা শৃঙ্খলার ভক্ত ছিলেন। স্টোয়িক মতবাদ (Stoicism) রোমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সিনেকা (Seneca-খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮-৬৫ অব্দ) সর্বপ্রথম রোমে স্টোয়িক মতবাদ প্রচার করেন। এপিকটেটাস (Epictetus-৬০-২০ খ্রি.) অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা, সাধুতা এবং নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে সুখ লাভ করা যায় এ মতবাদ প্রচার করেন।

রোমান সভ্যতা

রোমান সাহিত্য : সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রোমানরা গ্রিকদের অনুকরণে রচনা করেন। প্লুটাক (২৫৪–১৮৪ খ্রিষ্টপূর্ব) ১২টি নাটকের মাধ্যমে রোমের আচরণ ও কৃষ্টির আলোকপাত করেন। তিনি অভিজাত শ্রেণির মূল্যবোধকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। অগাস্টাসের যুগকে ল্যাটিন সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সিসেরো, গীতিকবি কেটুলাস (Cataullus), দার্শনিক লুক্রেটাস নিজ নিজ সাহিত্যকর্মে অসামান্য অবদান রাখেন। অগাস্টাসের সভাকবি ভার্জিল (Vergil ৭০–১৯ খ্রিষ্টপূর্ব) সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ইনিড (Aeneid) রচনার মাধ্যমে, রোমানদের বীরত্ব গাথা ও দুর্বলতা, কৃষ্টি কালচার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। হোরেস (Horace ৬৫–০৮ খ্রিষ্টপূর্ব) রোমের দ্বিতীয় প্রখ্যাত কবি। তিনি তার কবিতায় সংযম, নিষ্ঠা ও সাধারণ পল্লি জীবনের সৌন্দর্য চিত্র অঙ্কন করেন। ভোগবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী কবি ওভিড (Ovid- ৪৩–১৭ খ্রিষ্টপূর্ব) তার কবিতায় প্রেমের কাহিনি সুনিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলেন। অগাস্টাসের মৃত্যুর পরও রোমান সাহিত্য অব্যাহত থাকে। লিভি (Livy- ৫৯ খ্রিষ্টপূর্ব – ১৭ খ্রিষ্টাব্দ) 'History of Rome' গ্রন্থে রোমের বিজয় ইতিহাস ও গৌরবময় কৃতিত্বের বিবরণ তুলে ধরেন।

রোমান সভ্যতা

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : রোমান স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। তারা প্রধানত ইট ও কনক্রিটের স্থাপত্য তৈরি করলেও চৌকানো পাথর ব্যবহার করত। মার্বেল পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো কনক্রিটের কাঠামো। তাদের অসাধারণ কীর্তি হচ্ছে স্টেডিয়াম নির্মাণ। এছাড়া রোমের অন্যতম স্থাপত্য হচ্ছে সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির পেনথিয়ন। কলোসিয়াম নামে রোমে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি করা হয়েছিল। এ নাট্যশালার গ্যালারিতে ৫৬০০ দর্শক বসার ব্যবস্থা ছিল। রোমান ভাস্কর্যগণ সাধারণত দেবমূর্তি সম্রাট এবং বড় বড় কর্মকর্তাদের মূর্তি দক্ষতার সাথে তৈরি করতে পারত।

রোমান সভ্যতা

রোমান বিজ্ঞান : রোমানরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি। যে কয়জন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় হলো– বড় প্লিনি (Pliny the Elder) ৭৭ খ্রিষ্টাব্দে 'Natural History' নামে বিজ্ঞানবিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে অর্থনীতি পর্যন্ত এ বিশ্বকোষে আলোচিত হয়েছে। ইতালিতে বসবাসরত খ্যাতিমান চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন গ্যালেন (Galen)। তিনি ধমনিতে রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ভাবন করেন।

রোমান সভ্যতা

রোমান ধর্ম : রোমান গৃহ ছিল ধর্ম ও দেবদেবীর আখড়া। প্রত্যেক গৃহে জেনাস 'Janus' নামে একজন তত্ত্বাবধায়ক দেবতা ছিল। এছাড়া Vesta (ভেস্টা) আগুনের দেবতা, সার্টান ফসলের দেবতা, জুনো গর্ভবতী হওয়ার দেবতা, নেপচুন সাগরের দেবতা, ভেনাস প্রেমের দেবতা, জুপিটার আকাশের দেবতা– এরূপ বহু দেবতা তাদের ছিল। পণ্ডিত ভারো (Varo) বলেন, রোমানদের বিশ হাজার দেবদেবী ছিল। সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত অতীন্দ্রিয়বাদ খ্রিষ্টধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সপ্তাহের দিনগুলোর নাম গৃহের নামানুসারে রাখা এবং ২৫ ডিসেম্বর Savior দেবতার জন্মদিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা অতীন্দ্রিয়বাদে গৃহীত আচার-অনুষ্ঠান থেকে এসেছে।

রোমান সভ্যতা

রোমান আইন : প্রাচীন সভ্যতায় রোমানদের অন্যতম কৃতিত্ব হলো রোমন আইন ব্যবস্থা (Roman Law)। রোমান দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই সংকলিত হয়। এ আইনগুলো জনগণের সুবিধার্থে কাঠের ফলকে খোদিত করে রাজপথে প্রকাশে টানিয়ে রাখা হতো। এ আইনগুচ্ছকে বলা হতো দ্বাদশ তালিকা (Twelve Tables)। ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাত্রে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। বিশিষ্ট আইনবিদ ছিলেন গেইয়াস, আলপিয়ান প্যাপিলিয়ান এবং পলাশ। সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে এদেরকে আইনের ব্যাখ্যা ও মামলা নিষ্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়। এদের দ্বারা আইন সংস্কারের মাধ্যমে রোমান আইন একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ নতুন আইনের তিনটি শাখা ছিল; যেমন–

১. **বেসামরিক আইন :** এ আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল সিনেটে পাস করা আইন ও ডিক্রি Praetor-দের আদেশ এবং আইন দ্বারা কার্যকরী নির্দিষ্ট কতকগুলো প্রাচীন রীতিনীতি। এ আইন রোমান নাগরিকদের জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল।

২. **জনগণের আইন :** জাতীয় চেতনার প্রতি অমনোযোগীদের ওপর এ আইন প্রয়োগ করা হতো। এছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অনুমোদন, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নীতিনির্ধারণ ইত্যাদি ছিল এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এটিকে জনগণের আইন বলার সাথে সাথে বিদেশিদের জন্য আইনও বলা হতো।

৩. **প্রাকৃতিক আইন :** এ আইনের সারাংশ হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ সমান। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করার ক্ষমতা সরকারের নেই। এ আইনের জনক ছিলেন সিসেরো।

রোমান আইন দাস, বিধবা ও এতিমদের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হতো। রোমান আইন ছিল নিরপেক্ষ উদার ও মানবিক। সম্রাট জাস্টিনিয়ান রোমান আইনকে লিপিবদ্ধ করতে মন্ত্রী Robinian-কে প্রধান করে দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন ৪টি খণ্ডে রোমান আইন সংকলন করে। মধ্যযুগে এ আইনগুলো প্রায় সব দেশে ব্যবহৃত হতো।

রোমান সভ্যতা

রোমান সভ্যতার মূল্যায়ন ও প্রভাব : রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, নিদর্শন, কলাকৌশল ও চিন্তাধারা আজও বিলুপ্ত হয়নি। রোমান শিল্প, স্থাপত্য মধ্যযুগ তো বটেই আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দেশের ভবন নির্মাণকে প্রভাবিত করে। রোমান আইন আধুনিককালের ইউরোপ মহাদেশ, আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বে (বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশে) আইন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে নানাভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রোমান সাহিত্য মধ্যযুগের ইউরোপ জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রোমান রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সংগঠন ক্যাথলিক চার্চের সংগঠনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এভাবেই রোমান সভ্যতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব দেশে নানাভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, সভ্যতায় রোমানদের অবদান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

রোমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ভাইকিংদের নাম কী?

ক) রোমুলাস ও রেমাস

খ) সিজার ও পম্পে

গ) ক্যালিগুলা ও নেরো

ঘ) সিসেরো ও টিবেরিয়াস

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

রোমান সভ্যতার কোন শাসক অত্যন্ত স্বৈরাচারী হিসেবে পরিচিত?

ক) জুলিয়াস সিজার
খ) ক্যালিগুলা
গ) অগাস্টাস
ঘ) টিবারিয়াস

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

রোমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?

ক) নেপোলিয়ন খ) জুলিয়াস সিজার গ) অগাস্টাস ঘ) টিবারিয়াস

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

গ্রিক সভ্যতার ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’ কার লেখা?

ক) হেসিয়ড
খ) হোমার
গ) পিন্ডার
ঘ) থুকিডিডিস

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ০৯ আইয়্যামে জাহেলিয়া

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আইয়্যামে জাহেলিয়া

আইয়্যামে জাহেলিয়ার পরিচয় : আইয়্যামে জাহিলিয়া শব্দ দুটি আরবি শব্দ। 'আইয়্যাম' শব্দটি ইয়াওমুন-এর বহুবচন, এর অর্থ যুগ বা সময়। 'জাহিলিয়া' শব্দের অর্থ অন্ধকার বা অজ্ঞতা, তমসা। ঐতিহাসিক Goldziher– জাহিলিয়া শব্দের অর্থ Ignorance-এর পরিবর্তে Barbarism ব্যবহার করেছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক নিকলসনের মতে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দী কালকে আইয়্যামে জাহিলিয়া বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে আরব বলতে উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরবকে বোঝায়। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে আরব বলতে উত্তর আরবকে বোঝায়। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের অবস্থা বলতে সাধারণত উত্তর আরবকেই বোঝানো হয়ে থাকে। আইয়্যামে জাহিলিয়া বলতে এমন একটি সময়কালকে বোঝানো হয়, যে সময় আরবে সংবিধান ছিল না, কোনো নবি বা রাসুল ছিলেন না, কোনো ধর্মগ্রন্থ সার্বিকভাবে অনুসরণ করা হতো না।

ঐতিহাসিক ওয়েলহাউসেন (Wellhausen)-এর মতে, "আরবদের ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবন আদিম অবস্থায় ছিল। নীতিবোধ ও মানবতাবোধের অভাবে তাদের সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিল। অন্যায়-অবিচার ও অন্ধকারে আরববাসী নিমজ্জিত ছিল।" ঐতিাসিক পি. কে. হিট্টি-এর মতে, "সাধারণভাবে 'জাহিলিয়া' শব্দের অর্থ অজ্ঞতার বা বর্বরতার যুগ বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সে যুগকেই বোঝায়, যে যুগে আরবে কোনো নিয়মকানুন ছিল না, কোনো নবির আবির্ভাব ঘটেনি এবং কোনো ঐশী কিতাব নাজিল হয়নি।" তবে কোনো প্রকার প্রামাণ্য দলিলপত্র না থাকায় কখন এবং কার সময় এ অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন।

আইয়্যামে জাহেলিয়া

আইয়্যামে জাহিলিয়ার সময়কাল : কোন সময়কালকে তমসার যুগ বলা হয় বা আইয়্যামে জাহিলিয়ার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর থেকে শুরু করে মহানবি (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ সময়কে আইয়্যামে জাহিলিয়া বলে। তবে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ সময় অনেক নবি-রাসুল আল্লাহর বাণী দুনিয়ায় প্রচার করেছেন।

আরব ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পর থেকে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত সময়কে আইয়্যামে জাহিলিয়া বলা হয়।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আর. এ. নিকলসন ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দী সময়কে আইয়্যামে জাহিলিয়ার সময়সীমা বলে মত প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি তার এ অভিমতকে সমর্থন করে বলেন, "জাহিলিয়া যুগ বলতে মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। তবে বিশেষ করে ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত আগের (৫১০-৬১০ খ্রি.) একশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" নিকলসন ও হিট্টির এ মতটিই আইয়্যামে জাহিলিয়ার সময়সীমা সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কুরআনের প্রমাণ সাপেক্ষে আইয়্যামে জাহিলিয়াকে একটি অন্ধকারময়, তমসাচ্ছন্ন ও নীতিনৈতিকতাহীন সময় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে এ অবস্থার অবসান ঘটে এবং আরবে একটি সভ্য; সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ সমাজের সূচনা হয়।

MCQ (BOARD QUESTIONS)

আইয়ামে জাহেলিয়ার সময়সীমা কত?

ক. ১০০ বছর

খ. ১ বছর

গ. ১০ বছর

ঘ. ১০০০ বছর

Answer: A.
১০০ বছর

MCQ (BOARD QUESTIONS)

আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী?

ক. গোঁড়ামির যুগ
খ. প্রগতির যুগ
গ. কলির যুগ
ঘ. অন্ধকারাচ্ছন্নতার যুগ

Answer:D.
অন্ধকারাচ্ছন্নতার যুগ

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

(খ) আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কি বুঝায় ?

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক - ১০ রাজনৈতিক অবস্থা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে কোনো কেন্দ্রীয় সরকারব্যবস্থা ছিল না। দক্ষিণ আরবের কিছু অংশ ব্যতীত গোটা আরব কতকগুলো গোত্র শাসিত জনপদে বিভক্ত ছিল। বনু বকর, বনু তাগলিব, আবস ইত্যাদি গোত্র উল্লেখযোগ্য। প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **গোত্রীয় শাসন :** আরবের এক একটি পরিবার তাঁবুতে বসবাস করত। কয়েকটি তাঁবু নিয়ে একটি শিবির বা হাই গঠিত হয়। একাধিক হাই মিলে গঠিত হয় একটি গোত্র বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর প্রধান সদস্যের শাসন সবাই মেনে চলে। এক গোত্রের সঙ্গে অন্য কোনো গোত্রের শাসনগত পার্থক্য না থাকলেও ঐক্য ছিল না। নামের প্রথমে তারা বনু বা বানু... (বংশধর) লাগিয়ে গোত্রীয় ঐক্য বোঝাত। গোত্রপ্রধানের শাস্তি বা পুরস্কার সবাই মেনে চলত। মূলত গোত্র ছিল বর্তমানকালের একটি রাষ্ট্রের সমমর্যাদাসম্পন্ন। একজন ব্যক্তির পরিচয়, অধিকার ও কর্তব্য সবগুলো ছিল গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। গোত্রচ্যুত ব্যক্তি ছিল অনেকটা রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তির মতো। গোত্রচ্যুত ব্যক্তির নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার রক্ষাকবচ ছিল না। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "সাধারণত জাহিলিয়া শব্দটিই একতা বা বর্বরতার যুগকে বোঝায়, কিন্তু বাস্তবে এ শব্দটি এমন একটি সময়কে বোঝায় যখন আরবে কোনো বিধিবিধান ছিল না। কোনো অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রচারক ছিল না, ছিল না প্রত্যাদেশ হিসেবে আসা কোনো ধর্মগ্রন্থ।"

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

২. গোত্রপ্রীতি : গোত্রপ্রীতি হলো বেদুইন আরবদের মূল প্রেরণা। এ প্রেরণার মূল উদ্দীপনা হলো অন্য সদস্যদের প্রতি সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য। এককথায় তারা উগ্র গোত্রপ্রীতির সমর্থক P.K. Hitti 'Al-Mubarrad, Al-Kamil' গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন, "Its claim upon its members is strong enough to make a husband give up his wife." (সদস্যদের ওপর গোষ্ঠীর বা গোত্রের দাবি এতই প্রবল যে, গোত্রের প্রয়োজনে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকেও ত্যাগ করতে পারে।) তবে ব্যক্তি তার নিজের আর্থসামাজিক স্বার্থের কারণেই গোত্রপ্রীতি প্রদর্শন করত। যেহেতু কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল না, স্বাভাবিক জীবনধারণের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, সেহেতু ব্যক্তি নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে গোত্রভুক্ত থাকতে বাধ্য হতো। গোত্রীয় পরিচয় ব্যতীত সে যুগে অপরের শ্রদ্ধাবোধ কখনো আশা করা যেত না।

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

৩. **শেখ শাসন :** সকল গোত্রের নিজ নিজ দলপতি বা শেখ শাসক হিসেবে থাকতেন। গোত্রের শেখ নির্বাচনের জন্য গৌরব, মহানুভবতা, বীরত্ব, নিরপেক্ষতা, প্রবীণতা ও কতকগুলো ব্যক্তিগুণের প্রয়োজন হতো। গোত্রভুক্ত পরিবারের প্রধানরা যতদিন শেখকে মেনে নিতেন বা পরামর্শ দিতেন ততদিন শেখ তার পদে বহাল থাকতেন। P.K. Hitti একই গ্রন্থে বলেন, "His tenure of office lasts during the good will of his constituency." (শেখ যতদিন নির্বাচকমণ্ডলীর শুভেচ্ছা অর্জন করতে পারতেন, ততদিন উক্ত পদে বহাল থাকতেন।) তবে শেখ স্বৈরাচারী ছিলেন না। তিনি সাধারণত গোত্রের বিষয়াবলি বিশেষত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্তসমূহ গোষ্ঠীপ্রধানদের সাথে পরামর্শ করে গ্রহণ করতেন।

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

৪. **'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি :** কেন্দ্রীয় সরকার কাঠামো বা শাসনপদ্ধতি প্রচলিত না থাকায় আরবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। আরবের সর্বত্র 'জোর যার মুল্লুক তার' (Might is Right) নীতি প্রচলিত ছিল। প্রতিশোধ পরায়ণ হিসেবে রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে Blood Money বা 'আল দিয়াত' এর বিনিময়ে হত্যাকারী মুক্তিলাভ করতে পারত। কোনো হত্যাকারী গোত্র ত্যাগ করে পালিয়ে গেলে তাকে সমাজচ্যুত বা 'আল তারিদ' ঘোষণা করা হতো। সমাজচ্যুত ব্যক্তি কোথাও স্থান পেত না।

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

৫. গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ : গোত্রভুক্ত থাকার কারণে আরবদের মাঝে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম নিয়েছিল। এর ফলে আত্মসম্মানে আহত সদস্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিত না। ফলে গোত্রভুক্ত সদস্যদের মধ্যে কলহ লেগে যেত। শেখ এ কলহের মীমাংসা করতেন, যদিও তার ফৌজদারি ক্ষমতা ছিল সীমিত। গোত্রগুলো পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থাকলেও প্রায় কলহে লিপ্ত থাকত। এ কলহের কারণ ছিল তৃণভূমি ও জলাশয়ের অধিকার। তাছাড়া আরবগণ আজন্ম স্বাধীনতাপ্রিয়। প্রাণ অপেক্ষা স্বাধীনতাকে তারা শ্রেয় মনে করত। এ স্বাধীনতা কোনো গোত্র কর্তৃক সামান্য ক্ষুণ্ন হলেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হতো। জন্মগত বিরোধ বেদুইন জীবনের একটি শক্তিশালী ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়। যুদ্ধগুলো হতো মূলত এক পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও বীরত্বের প্রদর্শন হিসেবে, অন্য পক্ষকে সাধারণত খতম বা নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে নয়। বেশিরভাগ যুদ্ধে রক্তপাত ঘটত না। তবে সংঘাত, বিরোধ ও বৈরিতার জের চলত বছরের পর বছর কিংবা বংশ পরম্পরায়। অনেক সময় আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো। অতি সামান্য কারণে আরবে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ত। প্রথমে অল্প কিছু মানুষ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এরপর কয়েকজনের সংঘর্ষ সকলের সংঘর্ষে পরিণত হতো। শেষপর্যন্ত তৃতীয় কোনো নিরপেক্ষ দলের হস্তক্ষেপ ছাড়া শান্তি ফিরে আসত না।

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

৬. আল-মালা : প্রাক-ইসলামি আরবে শুধু মক্কাকে কেন্দ্র করে একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মক্কা নগর একদল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত হতো। এ ব্যবস্থাপক সভাকে বলা হতো মালা। যে গৃহে 'মালা'র বৈঠক বসত, তাকে দারুন নাদওয়া বলা হতো। কার্যনির্বাহী ক্ষমতা সীমিত হলেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত। যেমন– তীর্থযাত্রীদের রসদ সরবরাহ করা, পানি সরবরাহ করা, সৌর ও চন্দ্র বছরের মধ্যে পঞ্জিকার সামঞ্জস্য বিধান করা।

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

৭. **ইলাফ প্রথা :** পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের সাথে মক্কার শাসকশ্রেণির বয়োজ্যেষ্ঠদের পত্র বিনিময় ও নিরাপদে তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে অতিক্রম করে দেওয়ার চুক্তি (ইলাফ বা ইসাম) হতো। এছাড়া বিভিন্ন গোত্র মাঝে মাঝে সন্ধিসূত্রেও আবদ্ধ হতো। এটি ছিল উপজাতীয় সাধারণতন্ত্র (Tribal Commonwealth)।

প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

৮. **গোত্রীয় সংঘাত :** গোত্রীয় সংঘাত আরবদের জীবনের সাধারণ বিষয় ছিল। প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বিষয়সহ কিছু তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। এসব সংঘর্ষ একবার শুরু হলে তা দীর্ঘদিন ধরে চলত। একটি উটকে প্রহার করার ঘটনা নিয়ে বনু বকর ও বনু তাঘলিবের মধ্যে সংঘটিত 'বাসুসের যুদ্ধ' দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এসব গোত্রীয় কলহ 'আইয়াম আল-আরব' বা 'আরবদের দিন' নামে পরিচিত। আওস ও খাজরাজ গোত্রের লড়াই ৫ম শতাব্দীর শেষদিকে বনু বকর ও বনু তাগলিবের মধ্যে বাসুসের যুদ্ধ, দাহিস, আল-গাবরার যুদ্ধ ইত্যাদি ছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর অন্যতম। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের মতে, অজ্ঞতার যুগে আরবে প্রায় ১,৭০০টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

- আল মালা কী? (জ্ঞান)
- প্রাচীন আরবে গোত্রপ্রধানকে কী বলা হতো?
- কাকে 'শেখ' বলা হতো

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ আসাবিয়া বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন

রাশিদা বেগম 'বাংলাদেশ নারী অধিকার' নামক সংগঠনের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে এমন একটি সময় ছিল যখন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। তাদের কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। এসব সংঘর্ষ। 'ভারতীয়দের দিন' নামে পরিচিত। তারা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে। বিশ্বাসী ছিল।

ক. 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ কী?

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে রাশিদা বেগমের বক্তব্যে কোন সমাজের নারীর অবস্থা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত যুগের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করো।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক – ১১ **সামাজিক অবস্থা**

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা

১. **শহুরে আরব ও যাযাবর আরব :** প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ ছিল। সেখানে শ্রেণিবৈষম্য, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা ও অসততা বিদ্যমান ছিল। উত্তর আরবগণ ইসমাইল বংশীয় এবং দক্ষিণ আরবগণ কাহতান বংশীয় ছিলেন। এ দুধরনের ঐতিহ্য, ভাষা ও বংশগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আরবে দুধরনের জীবনযাত্রা দেখা যায়– বেদুইনের যাযাবর জীবনযাত্রা ও মরূদ্যানের স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা। স্থায়ী বাসিন্দারা অবস্থাভেদে কৃষিজীবী ও শহুরে ব্যবসায়ী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। তৎকালীন সমাজে দুশ্রেণির লোক বাস করত। যথা– যাযাবর বেদুইন ও স্থায়ী বাসিন্দা। মক্কা, মদিনা, তায়েফ ইত্যাদি স্থানে স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে। যাযাবরদের একটি অংশ ধীরে ধীরে শহুরে হয়ে ওঠে। উভয় শ্রেণির জীবনযাত্রার মান, সামাজিক মর্যাদা আলাদা ছিল। সামাজিক শৃঙ্খলার ধরন মরুবাসী বেদুইন ও শহুরেদের জন্য আলাদা ছিল। পরবর্তীতে আধা শহুরে ও আধা যাযাবর শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা

২. **আরব বেদুইন :** বেদুইন আরবগণ পশুপালন, ব্যবসায় বাণিজ্য ও লুটতরাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। স্থায়ী আরবগণ মরূদ্যান এলাকায় কৃষিকাজ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। বছরে চার মাস যুদ্ধবিরতি থাকার ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য, মেলা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে সম্ভব হয়েছিল। আরবেরা তাদের বংশধারা চল্লিশ পুরুষ পর্যন্ত মুখস্থ বলতে পারত। তাদের বিশাল বংশধারার ইতিহাস তাদের কাছে অতিমাত্রায় প্রিয় ছিল। এজন্য তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। এক বংশের লোকজন অন্য বংশের লোকজনদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত।

প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা

৩. **কুসিদ প্রথা :** প্রাক-ইসলামি আরবে কুসিদ প্রথার প্রচলন ছিল। ইহুদিরা একচেটিয়া কুসিদ ব্যবসায় করত। কুসিদজীবীরা এত নিষ্ঠুর ছিল যে ঋণ গ্রহণকারী অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন সুদগ্রহীতার স্ত্রী অথবা সন্তান-সন্ততিকে জোরপূর্বক দাসদাসীরূপে ব্যবহার বা বাজারে বিক্রি করতে পারত।

প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা

৪. কৌলীন্য প্রথা : আরবদের মধ্যে বংশগৌরব, বীরত্ব শৌর্যবীর্য নিয়ে সর্বদাই দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগে থাকত। এ সময়কার কৌলীন্য প্রথা থেকেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়।

৫. ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতা : প্রাক-ইসলামি আরবে ব্যভিচারের মাত্রা এতদূর ছাড়িয়ে যায় যে, লম্পট, দুশ্চরিত্র আরবরা পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করত। স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে নিকটবর্তী কোনো আত্মীয়ের সাথে বলপূর্বক বিয়ে দেওয়া হতো। তারা জীবন্ত উট থেকে মাংস কেটে তা ভক্ষণ করত।

প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা

৬. **নারীর অবস্থা :** ইসলামপূর্ব আরবে নারী সমাজের অবস্থা ছিল শোচনীয়। বিবাহ নামক এ পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা সবচাইতে বেশি অবহেলিত, নিগৃহীত ও অধিকারবঞ্চিত ছিল। বিবাহে নারীদের সমঅধিকার ছিল না। পুরুষ ইচ্ছামতো স্ত্রী গ্রহণ বা বর্জন করত। পুরুষেরা অনেক সময় বিবাহবহির্ভূতভাবে নারীদের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক রাখত। অন্যদিকে, স্বামীও তার স্ত্রীকে পর পুরুষের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াতে প্রচ্ছন্ন উৎসাহ বা সমর্থন দিত। এককথায় আধুনিক সমাজের ন্যায় বিবাহের পবিত্রতা ছিল না। চরম দারিদ্র্যের ভয়ে কোনো কোনো গোত্রে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। আবার কোনো কোনো দুর্বল গোত্র সবল গোত্রের নিকট পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় কন্যার ভবিষ্যৎ পরিণাম ভেবে হত্যা করা হতো। নারীর সামাজিক অবস্থান না থাকায় অনেক গোত্রে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করা অপমানজনক মনে করা হতো। এ থেকে রেহাই পেতে কন্যাকে হত্যা করা হতো। এখানে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, জীবন্ত কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হতো। পবিত্র কুরআন শরিফের সূরা তাকবীর (৮১:৮-৯) এর ৮-৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, "যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" এ থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন আরব সমাজে নারীর অবস্থান।

তৎকালীন কলুষিত সমাজেও পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় কিছু কিছু নারী গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আবু জেহেলের মা, খাদিজা তাদের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া অনেক নারী যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিতে কবিতা রচনা করতেন।

প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা

৭. **দাস-দাসীর অবস্থা :** স্বাধীন নারীর সামাজিক মর্যাদা যেখানে ভূলুণ্ঠিত, সেখানে পরাধীন দাসদাসীর অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে, সেটি ধরে নেওয়াই যুক্তিসংগত। তৎকালীন আরবে দুই প্রকার দাসের কথা শোনা যেত।

৮. **জুয়া খেলা :** জুয়া খেলার নেশায় আরব বেদুইনরা সময় সময় নিজ স্ত্রী-সন্তানদের বাজি হিসেবে ধরত। লুণ্ঠন, মদ্যপান এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যারা অধিক পারদর্শিতা দেখাতে পারত, সমাজ তাদের বীর খেতাব দিয়ে সম্মান জানাত। পরিশেষে বলা যায়, আরবদের নৈতিক গুণাবলির বর্ণনা ব্যতীত তৎকালীন আরবের সামাজিক অবস্থার পূর্ণ মসিচিত্র অসম্পূর্ণ। আরবদের ন্যায় অতিথিপরায়ণ জাতি পৃথিবীতে দুর্লভ। পরম শত্রুও আতিথ্য গ্রহণ করলে পরম আদর-যত্ন পেত। আরবদের গোত্রপ্রীতি ও ফাদারী (Fidelety) বিশ্ববিশ্রুত। সন্ধিবদ্ধ গোত্র বা আশ্রিত জীবন রক্ষার্থে তারা সবকিছু ধ্বংস করতে কুণ্ঠিত হতো না।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক – ১২ ধর্মীয় অবস্থা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। P.K. Hitti তার 'History of the Arabs' গ্রন্থে বলেন, "Judged by his poetry the pagan Bedouin of the Jahiliyah age had little if any religion." (তাদের কবিতা বিচার করে বলা যায়, জাহিলিয়া যুগের বেদুইন উপজাতির ধর্ম বলে প্রায় কিছুই ছিল না।) ধর্মীয় আচার-আচরণের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা হলো প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাদের রক্ষণশীল মনের শ্রদ্ধা। তাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল মূলত সর্বপ্রাণবাদমূলক। ঐতিহাসিক তাবারী, ইবনে খালদুন, ইবনে আছীর, ইবনে আসাবকর এবং হাদিসে সিয়াহ সাত্তাহ হতে জানা যায়, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে প্রধানত ৫টি ধর্মমত প্রচলিত ছিল। যথা– ১. জড়বাদী, ২. পৌত্তলিক, ৩. ইহুদি, ৪. খ্রিষ্টান ও ৫. হানাফিয়া।

১. **জড়বাদী/প্রকৃতি পূজক :** বেদুইনদের ধর্মবিশ্বাস ছিল আদিম প্রকৃতির। ঐতিহাসিক Wellhausen বলেন, "The religious of the Arabs as well as their political life was on a throughly primitive level." (আরবদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন আদিম অবস্থায় ছিল।) অন্যান্য আদিম জনগোষ্ঠীর মতো তারা জড় উপাসক ছিল। তারা মনে করত, চাষযোগ্য জমির উর্বরতার জন্য যে দেবতার ভূমিকা ছিল, সেটি উপকারী দেবতা এবং অনুর্বর জমির জন্য দায়ী দৈবশক্তি ছিল অপদেবতা বা শয়তান। এ বিশ্বাসের সূত্র ধরে গাছ, কূপ, গুহা, পাথর এমনকি যেকোনো উপকারী বস্তু পূজনীয় হয়ে উঠত।

প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা

২. **পৌত্তলিকতা :** তৎকালীন আরবেরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। প্রত্যেক গোত্রের নিজ নিজ এবং প্রত্যেক নগরীতে আলাদা দেবদেবী ছিল। হেজাজ ও নজদ ছিল পৌত্তলিকতার প্রধান কেন্দ্র। উজ্জা নামক দেবীকে কুরাইশরা খুব ভক্তি করত। তার উপাসনার জায়গায় তিনটি গাছ ছিল এবং এখানে মানুষকে বিশেষ আরাধনার অঙ্গ হিসেবে বলি দেওয়া হতো। মানাহ ছিল ভাগ্যের দেবী। মক্কা ও মদিনার রাস্তার মাঝামাঝি কুবেদ নামক স্থানে এর মন্দির ছিল। এ মন্দিরে একটি কৃষ্ণ পাথর ছিল। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকজন এ দেবীকে বেশি শ্রদ্ধা করত। তায়িফের নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে লাত অধিষ্ঠিত ছিল। মক্কা ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকজন তার ভক্তি করত। আদিম পরিবারগুলো মাতৃকেন্দ্রিক হওয়ায় আরাধনার পাত্র হিসেবে দেবীরা বেশি গুরুত্ব পেত। সুরা নাজমের ১৯ ও ২০নং আয়াতে লাত, উজ্জা ও মানাত দেবী সম্পর্কে বলা হয়েছে। আরবের লোকেরা অত্যন্ত বিনয় ও ভক্তির সাথে দেবদেবীর সামনে নতজানু হতো, অর্ঘ্য নিবেদন করত, তাদের দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, দেবদেবীগুলো তাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে সক্ষম। এর সাথে সাথে তারা আল্লাহর ক্ষমতাতেও বিশ্বাস করত। তারা দেবদেবীকে তাদের সুপারিশকারী মনে করত। কিছু কিছু দেবদেবী ও নারী শিশুকে তারা আল্লাহর কন্যা ও ফেরেশতা মনে করত। আল্লাহ পাক সুরা নাহলের ৫৭নং আয়াতে বলেন, "ওরা আল্লাহ পাকের জন্য কন্যাসন্তান নির্ধারণ করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র।" এজন্য তারা তাদের ফসল ও গবাদি সম্পদের একাংশ তাদের দেবদেবীর জন্য এবং একাংশ আল্লাহর জন্য রাখত। এভাবে তারা আল্লাহর সাথে দেবদেবীর অংশীদার বানিয়ে শিরক করত। সেই সময় ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন দেবদেবী থাকত। কাবাগৃহে এসব দেবতা ছাড়াও ৩৬০টি মূর্তি বা দেবদেবী ছিল। সেগুলোর মধ্যে হোবল, ওয়ার, যাওয়া, ইয়াগুস, ইয়াযুক, নসর, লাত উল্লেখযোগ্য।

প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা

৩. **ইহুদি ধর্ম :** ইহুদিদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। তাদের পরিত্রাণের জন্য হযরত মুসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেন। তাদের পথনির্দেশনার জন্য তাঁদের ওপর তাওরাত ও যাবুর ধর্মগ্রন্থদ্বয় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়নি। হিমিয়ার বনি হারেছ, ইবনে কা'ব, বনি কেনানা ও কেন্দা গোত্রসমূহ ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিল। এছাড়া খাইবার ও মদিনার কুরাইজা ও নাজির গোত্র ইহুদি ছিল। এ ধর্মে ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে দাবি করা হয়েছে। এভাবে তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরও শরিক করে শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা

৪. **খ্রিষ্টধর্ম :** হযরত ঈসা (আ.) (পাশ্চাত্য মতে যিশুখ্রিষ্ট)-এর অনুসারীদের খ্রিষ্টান বলা হয়। যিশুখ্রিষ্টের একেশ্বরবাদ পাদ্রি ও পুরোহিতদের হাতে বিকৃত হয়ে ত্রিত্ববাদে পরিণত হয়। তৎকালীন আরবের রবীয়া ও গাচ্ছান গোত্রদ্বয় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিল। 'কাজা' গোত্রেও এ ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। তারা মেরিকে মুসলিমদের নিকট মরিয়ম (আ.) আল্লাহর স্ত্রী এবং যিশুকে মুসলিমদের নিকট ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করত। এভাবে তারা আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে শিরকে লিপ্ত হতো। আল্লাহ পাক সুরা মরিয়মের ৩৪নং আয়াতে বলেন, "এ-ই মরিয়মের পুত্র ঈসা, এ সত্য, যে বিষয়ে ওরা বিতর্ক করে।"

প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা

৫. **হানাফিয়া :** ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও আরবে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী (আস্তিক) ছিল যারা হানিফ নামে পরিচিত। আস্তিকেরা আল্লাহকে সত্য জেনে তাঁর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করত। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জাতিভাই উমাইয়া বিন আবিসালাত এবং বিবি খাদিজা ও তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নৌফেল প্রমুখ ব্যক্তি একেশ্বরবাদ তথা হানাফিয়া ছিল। হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর ইবাদতকারীদের প্রতিনিধি ছিলেন বলে তাঁর সম্পর্কে হানিফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হানিফ বলা হয় তাঁদের যাঁরা মূল, স্বভাবজাত এবং আদিম ধর্মের অনুসারী। এখানে আদিম বলতে আল্লাহর তাওহিদের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরিফের ৩০নং সূরার ৩০নং আয়াতে হানিফ শব্দের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ ধর্মকেই সরল ধর্ম, সঠিক ধর্ম আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা বেশকিছু কুসংস্কারে বিশ্বাস করত। মৃত্যুপরবর্তী চিন্তা তাদের আচ্ছন্ন করেছিল। তারা মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে উট বেঁধে রেখে খাবার না দিয়ে মেরে ফেলত। উদ্দেশ্য ছিল পরকালে ওই মৃত ব্যক্তি কবর থেকে ওঠে উটটি যেন ব্যবহার করতে পারে। তারা ধর্মের নামে উট, ষাঁড় বা ছাগল ছেড়ে দিত। এছাড়া তারা লটারি বা তীর ছুড়ে ভাগ্য নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা শুভ-অশুভ নির্ণয় করত। গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করত।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

❖ প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ 'হানিফ সম্প্রদায়' কারা? ব্যাখ্যা কর।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক – ১৩ **অর্থনৈতিক অবস্থা**

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

১. **নাগরিকদের শ্রেণিবিভাগ :** মরুময় আরবের সমাজে যাযাবর ও শহুরে আরব এ দু'শ্রেণিতে নাগরিকেরা বিভক্ত ছিল। ফলে উভয়ের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল আলাদা।

- **রিক্ত যাযাবর :** যাযাবরদের মধ্যে এক শ্রেণি ছিল যারা ভাসমান অবস্থায় কালাতিপাত করত। তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল না। পশুপালন ও লুটতরাজ ছিল তাদের আয়ের অন্যতম উৎস। বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকে বলা যায়, তাদের জীবনযাত্রা ছিল ঠিক আমাদের দেশের ভাসমান বেদেদের মতো।
- **কিছুটা সচ্ছল যাযাবর :** এ প্রকারের যাযাবররা ছিল আধা যাযাবর ও আধা শহুরে। যাদের নিজস্ব বসতভিটা ছিল। পশুপালন ছাড়াও তাদের অন্য আয়ের উৎস ছিল। বছরের অবসরকালীন সময়ে তারা উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় যাযাবর জীবন পরিচালনা করত।

প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

- **শহরবাসী আরব :** শহরবাসী আরবেরা যাযাবরদের তুলনায় সচ্ছল ছিল। তারা হাজরামাউত, ইয়েমেন ও ওমান নিয়ে গঠিত দক্ষিণ আরবের উর্বর অঞ্চলগুলোতে আবাসভূমি গড়ে তুলেছিল। এছাড়া মক্কা, মদিনা ও তায়েফে জনবসতি ছিল। তাদের প্রধান উৎপাদিত ফসল ছিল খেজুর। এর কাঠ জ্বালানি, ছালা, মাদুর ও ছাদের উপকরণ, বিশেষ প্রক্রিয়ায় উটের খাবার ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হতো। মরুময় আরবে শিল্প-কলকারখানার প্রসার না ঘটলেও সচ্ছল আরবেরা ব্যবসায় বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। হযরত আবু বকর, হযরত ওসমানসহ বহু ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্য করতেন। মক্কার বণিকেরা এশিয়ার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার স্থলবাণিজ্য পরিচালনা করত। মদিনা শহর ইয়েমেন হতে বাণিজ্য পথের সাথে সংযুক্ত। উত্তর-পূর্বে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে মক্কা ছিল অন্যতম। জাহিলিয়া যুগে মক্কার বিভিন্ন এলাকা হতে লোকেরা হজ সম্পাদন করতে আসত। মহররম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ এ চার মাস যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন না থাকলেও আরবগণ এ মতের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছিল। জিলকদ মাসে উকায মেলা বসত। ২০ দিন ধরে এ মেলা চলত। ফলে প্রতিবছর হজ ও মেলা উপলক্ষ্যে আরবদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। কুরাইশ বংশের অর্থ সওদাগর বংশ। এ থেকে বোঝা যায়, কুরাইশরা ব্যবসায় বাণিজ্যে এগিয়েছিল। কুরাইশদের মধ্যে উমাইয়া শাখা ব্যবসায় বাণিজ্যে এগিয়েছিল। জমজম কূপ ছিল পানির অন্যতম উৎস। ফলে স্থানীয় ও বহিরাগত ব্যবসায়িগণ জমজম কূপের আশপাশে বিশ্রাম করত। এর ফলে জমজম কূপকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

২. ব্যবসায়-বাণিজ্য : মক্কায় কোনো পণ্য উৎপন্ন হতো না। ফলে ভৌগোলিক সুবিধা বা অসুবিধার কারণেই মক্কাবাসীরা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। দলগত বাণিজ্য সংঘও গড়ে উঠতে দেখা যায়। নারী উদ্যোক্তাও ছিল। কেউ টাকাপয়সা সিন্দুকে জমা রাখত না বরং ব্যবসায়ে লগ্নি করত। মুদ্রার সাথেও তারা পরিচিত ছিল। বাইজান্টাইন, সাসানীয়, হিমায়ার-এর রৌপ্য বা দিনার ব্যবহৃত হতো। এর সাথে সাথে মূল্যবান ধাতু, স্বর্ণ-রৌপ্যের তাল এবং স্বর্ণের গুঁড়া বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দাঁড়িপাল্লার প্রচলন ছিল। পেশাদার ওজনকারী হিসেবে কায়্যাল নিয়োগ করা হতো। আরবেরা সাধারণত বছরে দু'বার শীতে ও গ্রীষ্মে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বিদেশে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যেত। প্রত্যেক কাফেলায় পথপ্রদর্শক, সংবাদ বাহক, নিরাপত্তাকর্মী থাকত। কাফেলায় সাধারণত ১০০ হতে ৩০০ জন লোক থাকত। উটের সংখ্যা কোনো কোনো সময় ২৫০০-তে উপনীত হতো। আইম গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবন জুদআন, আব্দুর রহমান ইবন আওফ প্রমুখ বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আরবদের আন্তর্জাতিক বাজার ছিল বেশ বিস্তৃত। তারা বিভিন্ন দেশ হতে দ্রব্যাদি আমদানি করত। যেমন বসরা ও সিরিয়া হতে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যশস্য ও তেল; চীন হতে রেশমি কাপড়; পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে মসলা; আফ্রিকা হতে হাতির দাঁত, ক্রীতদাস ও সৈন্য; ভারত হতে খাদ্যশস্য ও কাপড়-চোপড়; দক্ষিণ আরব হতে সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি করা হতো। তাইফে খেজুর, মধু, তরমুজ, কলা, ডুমুর, আঙুর, চীনাবাদাম, জাম ও বেদানা পাওয়া যেত। তাইফ হতে মক্কায় সুগন্ধী আনা হতো।

প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

৩. **সুদ/কুসিদ প্রথা :** প্রাক-ইসলামি আরবে কুখ্যাত কুসিদ বা সুদ প্রথা চালু ছিল। তৎকালীন আরবে সুদের ভিত্তিতে টাকা খাটানোর প্রচলন ছিল। মক্কা, মদিনা, তায়েফসহ সর্বত্র বিশেষ করে ইহুদি পল্লিতে সুদের ব্যবসায় ছিল রমরমা। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়ত। ঋণগ্রহীতা অনেক সময় সর্বস্ব হারাত। অনেক সময় ঋণগ্রহীতার স্ত্রী, পরিবার-পরিজনকে বিক্রি করে সুদের টাকা মাসুল করা হতো। এরা সমাজে কুসিদজীবী নামে পরিচিত ছিল। মক্কায় ব্যাংক স্থাপিত ছিল। ফলে দাদন ব্যবসায় দ্রুত প্রসার লাভ করে।

৪. **কারিগর শ্রেণি :** মূর্তিপূজা চালু থাকায় মূর্তির কারিগর সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তাদের তৈরিকৃত দেবদেবীর সাথে ধর্মীয় আবেগ জড়িত থাকার কারণে কারিগররা সমাজে বিশেষ মর্যাদা পেত। সারাবছর মূর্তি তৈরি ও কেনাবেচা হওয়ার কারণে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক – ১৪ সাংস্কৃতিক অবস্থা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা

১. **কাব্যচর্চা-সাহিত্যচর্চা :** প্রাক-ইসলামি যুগে আরবরা সাহিত্যচর্চায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এ সময় অনেক কাসিদা বা গীতিকাব্য (ode) রচিত হয়। নিজ বংশের গৌরবগাথা ও বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে এসব গীতিকাব্য রচিত হতো। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা উন্নতমানের না হলেও আরবগণ সংস্কৃতিমনা ছিল। P.K. Hitti বলেন, "The Bedouin's Love of poetry was his one cultural asset." [২] (কবিতার প্রতি বেদুইনদের ভালোবাসা ছিল অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ।)

কাব্যরীতির উন্নয়নের প্রথম স্তরে ছিল দৈবপুরুষ ও গণকদারদের ছন্দ মিলযুক্ত গদ্য। উটের আরোহীর গানও আরবি সাহিত্যের গদ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। আরবদের সাহিত্যচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করে P.K. Hitti একই গ্রন্থে বলেন, "No people in the world, perhaps, manifest such enthusiastic admiration for literary expression and are so moved by the word, spoken or written as the Arabs." [৩] (আরবীয়দের মতো বিশ্বের আর কোনো জাতির মানুষই বোধ হয় সাহিত্যশৈলীর জন্য এত উৎসাহ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটায়নি এবং লেখ্য ভাষার দ্বারা এভাবে প্রভাবিত হয়নি।) কাব্য দিয়েই আরবীয়দের সাহিত্যচর্চার সূচনা। বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহকে কেন্দ্র করে কাব্যগুলো রচিত হয়েছিল। তখনকার আরবদের কাব্যচর্চা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ আর. এ. নিকলসনের (Reynold Alleyne Nicholson) মন্তব্য হলো, "সে যুগে কবিতা শুধু কিছু সংস্কৃতমনা লোকের বিলাসিতার বস্তুই ছিল না, বরং এটি ছিল তাদের সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।" 'দিওয়ান আল-হামাসা', 'আল মুফাজ্জালিয়াত', 'কিতাব আল-আগানি' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে রচিত গীতিকবিতাগুলো সংকলিত আছে।

প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা

২. কবিতা চর্চা ও কবিতার বিষয়বস্তু : প্রাক-ইসলামি যুগে কাব্যচর্চার প্রতি আরবদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই কবিতা চর্চা করত। গীতিকবিতা রচনায় আরবীয়রা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। গীতিকবিতার বিষয়বস্তুতে মৌলিক চিন্তা কিংবা সর্বজনীন আবেদন ফুটে উঠত না। কবিতার নৈর্ব্যক্তিক আবেদনের চাইতে কবিই পাঠকের আগে সামনে আসে। বিভিন্ন ছোটবড় যুদ্ধের ঘটনা, বংশ গৌরব, বীরত্ব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি, যুদ্ধের বিবরণ, উটের ভূয়সী প্রশংসা, প্রেম, যৌন আবেদন ইত্যাদি তৎকালীন গীতিকবিতার বিষয়বস্তু ছিল। কিনদা ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে গীতিকবিতার চর্চা বেশি হতো। অশ্লীল বিষয়েও কবিতা রচিত হতো। তবে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, আরবদের কবিতায় তাদের উন্নত ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া জানা যায় তৎকালীন আরবদের দৈনন্দিন জীবন, আতিথেয়তা, বীরত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে। এজন্য প্রাক-ইসলামি যুগে রচিত কবিতাগুলোকে 'The Public Register of the Arabs' বলে অভিহিত করা হয়। এ যুগের খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে ইমরুল কায়েস, তারাফা, আমর ইবনে কুলসুম, লাবিদ ইবনে রাবিয়া, আনতারা ইবনে শাদ্দাদ, হাসির ইবনে হিল্লিজা ও যুহায়ের প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে কাব্যপ্রতিভা ও সৃজনশীলতার দিক থেকে ইমরুল কায়েস ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা

গদ্য রচনা ও প্রবাদ বাক্য : তৎকালীন আরব সমাজে গীতিকাব্যের তুলনায় গদ্য রচনা ও প্রবাদবাক্য অপ্রতুল ছিল। তৎকালীন আরবে গীতিকবিতাই অধিক সমৃদ্ধ ছিল। আরবীয়দের প্রবাদ বাক্য বা প্রবচনের জুড়ি মেলা ভার। আরবীয়দের বিভিন্ন প্রবাদ বা প্রবন্ধ আজও মানুষের চিন্তাচেতনাকে আলোড়িত করে। মহাজ্ঞানী লোকমান (আল হাকিম) ছিলেন আবিসিনীয় কিংবা হিব্রু। তিনি বহু প্রবাদ বাক্য রচনা করেছেন। এছাড়া প্রবাদ বাক্যের রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আখতার ইবন সাইফি, হাজির ইবন জুরারা, আল-খাসের কন্যা হিন্দ প্রমুখ। একটি বিখ্যাত আরবীয় প্রবাদ হলো- মানুষের সৌন্দর্য নিহিত আছে তার বাগ্মিতার মধ্যে। অপর একটি বিখ্যাত আরবীয় প্রবাদ হলো— জ্ঞানের সাহায্যে তিনটি জাতি আলোকিত হয়েছে। যথা—ফ্রাঙ্কদের চিন্তার ক্ষমতা, চীনাদের হাতের নৈপুণ্য ও আরবীয়দের বাগ্মিতা।

প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা

৪. উকাজ মেলা ও সাব-আ মুয়াল্লাকাত : প্রাক-ইসলাম যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকাজ মেলার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রতিবছর হজের মৌসুমে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে মক্কার উপকণ্ঠে অবস্থিত উকাজে এ মেলা বসত। উকাজ মেলায় স্থানীয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের পাশাপাশি অনেক বিদেশি পণ্য প্রদর্শিত হতো। জিলকদ, যিলহজ, মহররম ও রজব মাসগুলো পবিত্র হিসেবে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ ছিল। এ সময়ে উকাজ মেলা বসত। মেলায় দেশীয় পণ্য, বাসনপত্র, ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য পণ্যের কেনাবেচা হতো। নাচগান, মদ্যপান ইত্যাদির আসর বসত। আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিচারক হিসেবে নিযুক্ত থাকতেন। বিখ্যাত কবিগণ স্বরচিত কবিতা আবৃতি করতেন। বছরের সেরা ৭টি কবিতা মিশরের লিনেন কাপড়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখে কাবা গৃহের দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হতো। সাতটি কবিতার সমষ্টি 'সাবআ মুয়াল্লাকাত' বা (Seven suspended poems) নামে অভিহিত। এগুলো প্রাচীন আরবি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, "ইসলামপূর্ব দিনগুলোতে উকাজ মেলা আরবে এক ধরনের মতবিনিময়ের শিক্ষায়তন বলে গণ্য হতো।" তিনি উকাজ মেলাকে 'Academic Francaise" বলে অভিহিত করেন।

৫. আরবি ভাষা : আরবি ভাষা জাহিলিয়া যুগেও খুব সমৃদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, মধ্যযুগে বহু শতাব্দীকাল ধরে এটি (আরবি ভাষা) সভ্যজগতের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং উন্নতির একমাত্র মাধ্যম ছিল।

প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা

৬. কুলজি : সাধারণত বংশপুঞ্জিকে কুলজি বলা হয়। একজন সাধারণ নাগরিকও ১০ থেকে ১৫ জন পূর্বপুরুষের নাম মুখস্থ রাখত। একজন মর্যাদাবান ও শিক্ষিত নাগরিক ৪০ বা ৫০ জন পূর্বপুরুষের নাম মুখস্থ বলতে পারত। এ বংশ তালিকা সংরক্ষণের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব আরোপ করার কারণে এ বংশ তালিকা বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। তাদেরকে 'নুসসাব' বা বংশ বিশারদ বলা হতো। তাদের কাজ ছিল বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী ও পরিবারের বংশ তালিকা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রকাশ করা। এরূপ গোটা প্রক্রিয়াকে কুলজী সাহিত্য বলা হতো। জাহিলিয়া যুগে হযরত আবু বকর (রা.) একজন কুলজী বিশারদ ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম তাকওয়াভিত্তিক সমাজ, দেশ গঠনে গুরুত্ব দেয়। ফলে ইসলামে গোত্রীয় কৌলীন্য ও গোত্রীয় বংশমর্যাদার আলাদা হ্রাস পায়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

প্রাক-ইসলামি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

সাব-আ-মুয়াল্লাকাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০১ : প্রাক-ইসলামি আরব

টপিক – ১৫ যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১ - প্রাচীন আরব উপদ্বীপ
টপিক ০২ - মিশরীয় সভ্যতা
টপিক ০৩- সুমেরীয় সভ্যতা
টপিক ০৪ - ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
টপিক ০৫ - অ্যাসিরীয় সভ্যতা
টপিক ০৬ - হিব্রু সভ্যতা
টপিক ০৭ - গ্রীক সভ্যতা
টপিক ০৮ – রোমান সভ্যতা
টপিক ০৯ - আইয়্যামে জাহেলিয়া
টপিক ১০ - প্রাক-ইসলামী আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ১১ - প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক অবস্থা
টপিক ১২ - প্রাক-ইসলামী আরবের ধর্মীয় অবস্থা
টপিক ১৩ - প্রাক-ইসলামী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ১৪ - প্রাক-ইসলামী আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

টপিক ১৫ - প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

This Topic is important for

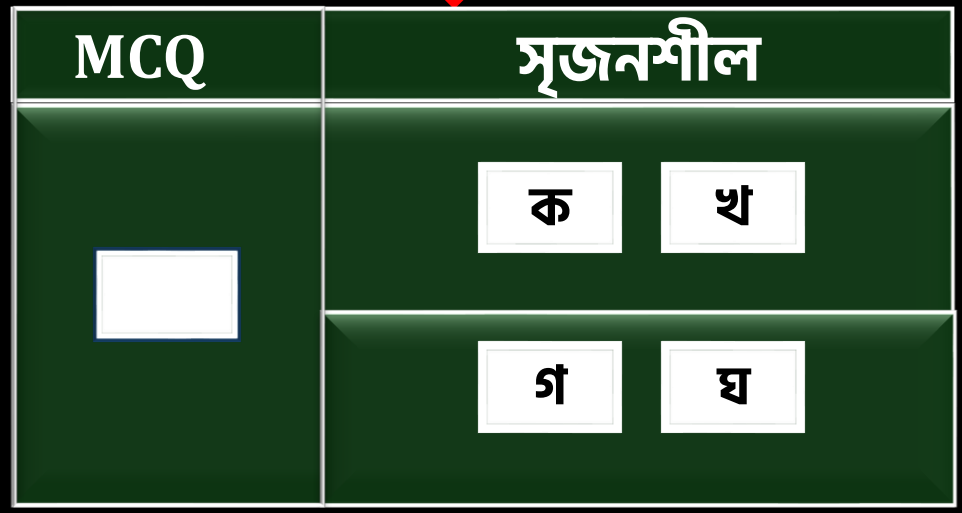

প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

আতিথেয়তা : জাহিলিয়া যুগের সমাজে আরবদের এমন কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলির কথা জানা যায়, যা সর্বকালে সর্বদেশে গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য। তাদের আতিথেয়তার নীতি ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। কোনো মেহমান নিজ পিতার খুনি হলেও তারা আতিথেয়তার নীতি লঙ্ঘন করত না ও মেজাজ হারিয়ে ফেলত না। তারা আশ্রয় দেওয়া অবস্থায় মেহমানের কোনো ক্ষতি করত না। আরবদের আতিথেয়তা যুদ্ধের কুপ্রভাবকে কিছুটা হলেও উপশম করতে পেরেছিল। রুক্ষ ও ভয়াল প্রকৃতির সাথে লড়াই করে জীবনধারণের জন্যই তাদের মাঝে আতিথেয়তার চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। আতিথেয়তার কারণে আরবদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়েছিল।

প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

ভ্রাতৃত্ববোধ : অত্যন্ত শুষ্ক ও গ্রীষ্মপ্রধান আরব উপদ্বীপে বসবাসের জন্য একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ফলে প্রাকৃতিক কারণেই তারা অন্যের বিপদে এগিয়ে এসে ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হতো। শহরে ও যাযাবর আরবদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব প্রধানত তাদের দুটি গোষ্ঠীর নিজ স্বার্থ ও আত্মরক্ষার জরুরি প্রয়োজনেই নিয়ন্ত্রিত হতো। গোত্র যেহেতু মানবজীবনের সকল চাহিদার যোগান দিতে পারত না, তাই তারা বাধ্য হয়ে অন্য গোত্রের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করত। অনেক সময় দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেও দুটি গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হতো। এছাড়া সামরিক নিরাপত্তার জন্যও ছোট ছোট গোত্রকে অপেক্ষাকৃত বড় গোত্রের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হতো। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লিখিত রূপ না থাকলেও তা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় বলবৎ থাকত। যেমন– মদিনায় দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আউস ও খাজরাজ গোত্রকে অন্যান্য গোত্র সমর্থন করত এবং প্রয়োজনে সাহায্য করত। তায়ি, গাতফান, তাগলিব ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলো ছিল উত্তর-আরব উপজাতিগুলোর মিত্র গোত্র। কোনো ক্রীতদাস স্বাধীন হওয়ার পর অথবা কোনো গোত্রছুট ব্যক্তি যেকোনো গোত্রের সাথে নির্দিষ্ট পন্থায় সদস্যভুক্ত হতে পারত।

প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

উদার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি : আরবদের উদার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরব সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। সারাবছর আরবদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকলেও তাদের মাঝে একটি অলিখিত চুক্তি ছিল, বছরের ৪ মাস সকল প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। দীর্ঘকাল এই ৪ মাস (মহররম, রজব, যিলকদ ও যিলহজ) তাদের নিকট পবিত্র ছিল। এছাড়া পবিত্র কাবা ছিল পবিত্র এলাকা। এ নিয়মগুলো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। এ চার মাস আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকত। ফলে এ সময় বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

উকাজ মেলা : প্রতিবছর আল তাইফ ও নাখলার মাঝে উকাজ মেলা বসত। মেলার একটি অংশে সাহিত্য সম্মেলনের মতো আসর বসত। বিখ্যাত কবিদের রচনার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হতো। বিজয়ী কবিকে পুরস্কৃত করা হতো।

উকাজ মেলাকে আরবে এক ধরনের মতবিনিময়ের শিক্ষায়তন বলে গণ্য হতো। উকাজ মেলাকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। দেশীয় বাসনপত্রের ও আন্তর্জাতিক পণ্যের প্রদর্শনী হতো। বিভিন্ন দোকানিরা তাদের পণ্য সাজিয়ে রাখত। আরবেরা দোকানে দোকানে ঘুরত, মদ পান করত। মেলার একাংশে নাচ-গানের আয়োজন করা হতো। সারা বছরের অনুশীলনকৃত নাচ ও গানগুলো এখানে দেখানো ও শোনানো হতো। এতসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হতো শুধু আরবদের উদার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে। আরবরা এ সময় শত্রুতার কথা ভুলে যেত, যোগ্যতা ও দক্ষতার নিরিখে বিজয়ী ঘোষণা দেওয়া হতো। ব্যক্তি পুরস্কার, কৃতিত্ব, সুনাম বা যশ গোত্রীয় বলে বিবেচিত হতো।

প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

স্বাধীনচেতা : আরবরা জন্মগতভাবেই স্বাধীন ছিল। তারা পরাধীনতাকে মৃত্যুর সমান মনে করত। তারা কোনোকিছুর বিনিময়ে নিজেদের স্বাধীনতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। মূলত আরবের ভৌগোলিক পরিবেশ তাদের স্বাধীনচেতা হতে বাধ্য করে। তারা মাথার উপর বিশাল নীলাকাশ আর উন্মুক্ত মরুভূমিকে জীবনের প্রাণ মনে করত। তাই স্বাধীনচেতা গুণটিই তাদের মহিমান্বিত করেছে।

প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

কবিদের মর্যাদা : প্রাক-ইসলামি আরবে এমন কতিপয় ব্যক্তির কথা জানা যায় যারা সত্যবাদিতায়, আতিথেয়তায়, ভ্রাতৃত্ববোধে এবং উদার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরের নিকট আদর্শস্থানীয়। এক্ষেত্রে তিনজন কবির নাম জানা যায়, যারা সকল মানবিক গুণাবলিকে নিজের মধ্যে ধারণ ও লালন করতেন। তারা হলেন– হাতেম তাঈ, কা'ব ইবন মামা ও হারিস ইবন সিনান আল মুররি। ইমরুল কায়েসও ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। হাতেম ছিলেন তাঈ বংশের কবি। তার বাবার নাম সাহাবা আদি ইবন হাতেম এবং মায়ের নাম সাফানা বিনতে হাতেম। তিনি ৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে তুরান হাই নামক স্থানে কবরস্থ করা হয়। কবি শেখ সাদী তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গুলিস্তানে' তার উদারতা, সততা ও মহানুভবতার বিবরণ দিয়েছেন। হাতেম তাঈকে কেন্দ্র করে বহু দেশে ও বহু ভাষায় সিনেমা ও টেলিভিশনে সিরিজ তৈরি হয়েছে। তার সত্যবাদিতা, দানশীলতা, আতিথেয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তাকে আরবের আইক ((icon) হতে সাহায্য করেছে। তাকে কেন্দ্র করে অনেক প্রবাদও তৈরি হয়েছে। অপর দুজন কা'ব ইবন মামা ও হারিস ইবন সিনান আল মুরির ছিলেন উদারতা, সততা, সত্যবাদিতা ও দানশীলতার মূর্ত প্রতীক। কা'ব মক্কার জনগণকে বিনা পয়সায় পানি পান করাতেন। হারিস ইবন সিনান উদারতা ও পরোপকারীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এছাড়া প্রাক-ইসলামি আরবের বহু কবি ও বিশিষ্টজনের গুণের কথা বলা যায়। যেমন ইসলামি বিশ্বকোষে আবু জেহেলের স্বাধীনচেতা উদারতা, শিষ্টতা, চিরনির্লোভ ইত্যাদি গুণের কথা বলা হয়েছে। আব্দুল মুত্তালিবও ছিলেন বহু সদগুণের অধিকারী।

প্রাক-ইসলামী যুগের কতিপয় উৎকৃষ্ট গুণাবলি

সৃজনশীল প্রতিভা : প্রাক-ইসলামি যুগে আরবরা অসাধারণ সৃজনশীলতা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল। তারা প্রবাদ বাক্যে খুবই পারদর্শী ছিল এবং একশত পূর্বপুরুষের নাম মুখস্থ বলতে পারত। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারীদের তিন ভাগে ভাগ করা হতো। যথা- ১. খতিব বা বক্তা, ২. শায়েব বা কবি এবং ৩. নোচ্ছাব বা বিভিন্ন গোত্রের পরিচায়ক বা কুলজি বিশারদ।

THANK YOU